অদ্ভুত আঁধার এক

জাকির তালুকদার

কয়েকটা বাবলা কাঁটা আর খয়ের গাছ ছাড়া এই মাঠে থাকার মধ্যে আছে শুধু ঘাস। কথা ছিল এখানে গ্রামের গোরস্তান হবে। কিন্তু সবটুকু জমির মালিকানা না পাওয়ায় কাজটা করা হয়ে ওঠেনি। সাত শরিকের মধ্যে তিনজন জমি লিখে দিয়েছে গোরস্তানের জন্য। চারজন দেয়নি। সেই কারণে গত বারো বছর ধরে পড়ে আছে পুরো জমি। কেউ আসে না ফসল ফলাতে। ফলে মাটির বড় বড় চাঁইয়ের ফাঁকে ফাঁকে বেড়ে উঠেছে ঘাসের জঙ্গল। এই মাঠে দাঁড়ালে জ্যোৎস্না বোঝা যায় খুব সুন্দর। জ্যোৎস্না রাতে মাঠের মধ্যে দাঁড়ালে মনে হয় পবিত্র মোলায়েম অপার্থিব এক আলো ঢুকে যাচ্ছে শরীরের সবগুলি লোমকূপে।

বদরে আলম কবি নয় তবু জ্যোৎস্নারাত তাকে ডাকে। সেও সাড়া দেয় সেই ডাকে। অনেক রাত অব্দি চাঁদে পাওয়া মানুষের মতো ঘুরে বেড়ায় কিংবা বসে থাকে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাঠে। জীবনে তেমন কিছু পায়নি বদরে আলম। তবু কথায় কথায় আল্লাহর শোকরগুজারি করা তার অভ্যেস। কয়েকবার সে বলে যে, আল্লাহ্‌র দরবারে লাখ লাখ শোকর কেননা আল্লাহ্‌ তাকে এত সুন্দর জ্যোৎস্না দেখার তৌফিক দিয়েছে।

দিনের বেলা এই বদরে আলমকে দেখে বোঝাই যায় না সে এত রোমান্টিক মনের অধিকারী। ছোটবেলা থেকেই দিনে পাঁচ অক্ত নামাজ আর রমজানের রোজায় অভ্যস্ত। কৈশোরে বছর তিনেক পড়েছিল গাঁয়ের মক্তবে। পড়া বলতে অতটুকুই। কেতাবি পড়াশোনায় ছেদ ঘটলেও সমাজে থাকলে মানুষের তথ্য ভাণ্ডার এবং জ্ঞানের বিস্তার কিছু না কিছু ঘটেই। তার ইসলামি জ্ঞান বাড়ে ওয়াজ-নসিহত শুনে। আশপাশে গাঁ-গঞ্জে যত ওয়াজ মাহফিল হয়, সব জায়গাতেই পারতপক্ষে তার যাওয়া চাই। আর দেশ-সমাজ-দুনিয়া সম্পর্কে তার দৃষ্টি প্রসারিত হয় চায়ের দোকানে খবরের কাগজ পড়ুয়া লোকের আড্ডা থেকে। অন্য কোনো কাজ শেখা হয়নি বদরে আলমের। কৈশোর থেকেই গাঁয়ের মসজিদে আজান দেওয়া ছিল তার শখের নেশা। চিকন মেয়েলি সুরেলা গলার আজানের সুখ্যাতি তার ছিল। যতদিন যায় সুরা-দোয়া তেলওয়াতের দক্ষতা তার বেড়ে চলে। শেষে সেটাই তার পেশা হয়ে দাঁড়াবে একথা সে নিজেও কখনো ভেবেছিল কি? এছাড়া অবশ্য তার কোনো উপায়ও ছিল না। ছোটবেলায় বাপ মরেছে। মা ছাড়া তার আর কেউ নেই। জমি নেই যে চাষবাস করবে। পুঁজিপাট্টা নেই যে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে মানুষের কাছ থেকে ধর্মীয় বিষয়াদিতে চাঁদাপত্র তোলায় তার সহজাত দক্ষতা রয়েছে। কোরবানীর ঈদে মক্তব-মাদ্রাসার জন্য চামড়া তোলা, জুম্মাবারে মসজিদের জন্য মুসল্লিদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা, তালবেএলেমদের জায়গীর থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া, ওরস-মিলাদের জন্য চাঁদা তোলা ইত্যাদি কাজে তাকে সবসময় আগবাড়িয়ে যেতে দেখা যায়। পরবর্তীতে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় তার পেশা। সে এখন মসজিদ-ঈদগা-মাদ্রাসার জন্য প্রফেশনাল চাঁদা আদায়কারী। পাটি বিছিয়ে পথের পাশে মাইক হাতে তাকে বসিয়ে দাও, সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেশ কিছু টাকা তুলে ফেলবে। যেখান থেকে অন্য লোক চাঁদা চাইতে গেলে দশ টাকার বেশি পায় না, সেখান থেকে সে বিশ-তিরিশ এমনকি পঞ্চাশ টাকাও তুলে নিয়ে চলে আসবে।

তার এই দক্ষতা আশপাশের দশ-বারোটা গাঁয়ে সুবিদিত। ফলে নলডাঙাতে নতুন মসজিদ তৈরি হবে, তো টাকা তোলার জন্য ডাকো বদরে আলমকে। কিংবা বাসুদেবপুরে নতুন ঈদগা তৈরি হবে, ডাকো বদরে আলমকে। অথবা বীরকুৎসাতে কওমী মাদ্রাসা বসবে, শরণাপন্ন হও বদরে আলমের।

প্রথম প্রথম সে কমিশন পেত শতকরা পঁচিশ টাকা। এখন জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। তাছাড়া নাম-ডাকও বেড়েছে তার। এখন তার কমিশন শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা।

লিকলিকে শরীর তার। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট। শুকনো হওয়ার জন্য আরও লম্বা দেখায়। নিজের উচ্চতা নিয়ে গাঁয়ে সে একটু লজ্জিত বোধ হয়। এই কারণে সবসময় সামনের দিকে কুঁজো হয়ে থাকে। দাড়ি-গোঁফে কোনোদিন খুর ছোঁয়ায়নি সে। কিশোর বয়সেই হাদিস শুনেছিল যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনোদিন দাড়ি কামাবে না সে বেহেস্তে ইব্রাহীম পয়গম্বরের সঙ্গী হবে। কখনো না কামানোর ফলে তার দাড়ি পাতলা। মোলায়েম ও কচি একটা ভাব ফুটে থাকে মুখমণ্ডলে। পরনে থাকে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি। টুপি মাথায়। সাদা গোল টুপি। সব মিলিয়ে একেবারেই সাধারণ ছিমছাম চেহারা তার। শুধু তার বিশেষত্ব বোঝা যায় শুধু তখনই, যখন সে দোয়া-কালাম তেলওয়াত করে ঘুরে ঘুরে টাকা তোলে। পেশাদারী দক্ষতার সাথে অনায়াস সাবলীলতা তখন তাকে বিশিষ্ট করে তোলে। মনে হবে তার জন্ম হয়েছে এই কাজের জন্যই।

এখন সে চাঁদা তুলছে নলডাঙার বেহেশতী নূর জামে মসজিদের জন্য। মসজিদের জন্য জমি কিনে দিয়েছে আলহাজ্ব আব্দুল মজিদ। আগে লোকটা নাকি ছিল চোরাচালানি। ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ বর্ডারে ইধারকা মাল উধার আর উধারকা মাল ইধার করত। তখন তার দাপট ছিল প্রচণ্ড। থানা-পুলিশ-বিডিআর সব তার কেনা। দিনে হাজার টাকার ওপরে শুধু মদের খরচ ছিল তার। মেয়ে মানুষ নিয়ে সে যেসব কাজ করেছে সেগুলো এখনো এ তল্লাটে কিংবদন্তী হয়ে আছে। লেখাপড়া তেমন জানে না কিন্তু তার বুদ্ধির কাছে এমএ পাশ নস্যি। এরশাদ প্রেসিডেন্ট থাকার সময় এখানে মিটিং করতে এলে সে মঞ্চে উঠে নিজের হাতে এরশাদকে উপহার দিয়েছিল সোনার লাঙল। তো বেশ টাকাকড়ি কামিয়ে নিয়ে তওবা করেছে আব্দুল মজিদ। গঞ্জের সবচেয়ে বড় শাড়ি-কাপড়ের দোকান এখন তার। বেশ কয়েকটা বাস-ট্রাকেরও মালিক সে। হজ্ব করে আসার পর থেকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে। মদ-মাগীর নেশা সে ত্যাগ করেছে। এখন তার দোকানে দিনভর বেচাকেনা চলে। সে ক্যাশে বসে বসে তসবিহ টেপে।

সে বলে যে, গরীব ঘরের ছেলে হয়েও সে এত শান-শওকতের মালিক হয়েছে শুধু আল্লাহ্‌র দয়ায়। তাই সে চায় যে তার এলাকায় একটা আল্লার ঘর হোক যে ঘরে মুসল্লিরা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে পারবে, যে ঘরের মিনার থেকে দিনে পাঁচবার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে আল্লার পথে আসার ডাক। সে তাই এককথায় মসজিদের জন্য দিয়ে দিয়েছে পুরো একবিঘা জমি।

গত ছয় মাস হলো এই মসজিদের জন্য চাঁদা তুলছে বদরে আলম। গঞ্জের এ মাথা থেকে বাসে ওঠে। বয়ান করে, চাঁদা তোলে। মাইল দুয়েক দূরের পরের স্টপেজে নেমে পড়ে। সেখান থেকে ওঠে ফিরতি গাড়িতে। চাঁদা তুলতে তুলতে এসে পৌঁছায় গঞ্জে। এইভাবে দিনভর বাস বদল। সারাদিন চাঁদা তোলার পরে এশার নামাজ শেষে মসজিদ কমিটির কাছে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে নিজের কমিশন বুঝে নিয়ে বাড়ির পথ ধরা। তার আগে চাল-ডাল মাছ-তরকারি কিনে নিতে হয়।

০২.

১৯৯২ সালের শুরুতে হঠাৎ করে মনা মাস্টার খেয়াল করে যে তার হাতে অখণ্ড অবসর। ইস্কুলে ছেলে পড়ানোর পরে তার আর অবশ্যকর্তব্য বলে কিছু নেই। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার অবশ্যকর্তব্যের তালিকা বেড়েই চলছিল। তার অবশ্যকর্তব্যের তালিকায় স্ত্রী ফিরোজা আর মেয়ের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়াও ছিল। কিন্তু পার্টির কাজের চাপে ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিল ওদের ক্ষেত্র। পার্টির গ্রুপ মিটিং, কমিটি মিটিং, গণসংগঠনগুলোর খোঁজ নেওয়া, তাদের একটার পর একটা কর্মসূচি, পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকার গ্রাহক বাড়ানো, স্টাডি সার্কেল, কর্মীদের মামলা-জেল-জামিন এইসব একটার পর একটা কাজ মিলে তার চারপাশে যে প্রাচীর সৃষ্টি করেছিল, স্ত্রী-কন্যার অনুযোগ সেই দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যেত নিজেদেরই কাছে। ফলে একসময় ছোট্ট মেয়ে মালাও বুঝে ফেলেছিল, বাবার মনটা খুব করে চাইলেও তাদের জন্য সময় বরাদ্দের সুযোগ খুবই কম। এবং তার ফলে অনিশ্চিত কিন্তু যান্ত্রিক একটা পারিবারিক জীবন।

সেই জীবনে হঠাৎ ছন্দপতন। প্রায় যতিচিহ্নের মতো। মনা মাস্টার, কমরেড মনোয়ার হোসেনের কাজ কমতে থাকে। কাজ কমে, অস্থিরতা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে প্রশ্ন। নিজের। সঙ্গীদের। কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। ফলে আরো বেড়ে চলে অস্থিরতা। প্রথমে বার্লিন প্রাচীর। সোলেমান পয়গম্বর যেমন ইয়াজুজ-মাজুজের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য তৈরি করেছিলেন বার্লিন প্রাচীর, তেমনি পুঁজিবাদের পুঁজ-রক্ত-

বিষবাষ্প থেকে পূর্ব জার্মানীর মানুষকে রক্ষার জন্য বার্লিন প্রাচীর। কিন্তু সেই প্রাচীর ভেঙে পড়ল। একের পর এক পোল্যান্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লাভাকিয়া। তারপর একদিন মস্কোতে খণ্ড-বিখণ্ড হলো লেলিনের মূর্তি। বিপ্লবের পিতৃভূমি পাশ ফেরাল পুঁজিবাদের দিকে। মনা মাস্টারের তখন বাইরে বেরুতে লজ্জা করে। বাইরে বেরুলেই অশ্লীল ইঙ্গিত করে বিএনপি জামায়াত এমনকি আওয়ামী লীগের লোকজনও। ফলে বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় পায়ে ভর করে রাজ্যের জড়তা। বিদেশে তো ঐসব ঘটনা ঘটেই চলেছে। এদিকে দেশে? যে মুহূর্তে সোভিয়েতের পতন, সঙ্গে সঙ্গে পার্টি অফিসে তালা। পার্টির পত্রিকা বন্ধ। তারপরেই পার্টি ছাড়ার হিড়িক। যে নেতাদের মনে হতো তাত্ত্বিকভাবে দৃঢ়, মানুষের মুক্তির জন্য নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন, তারা রাতারাতি হয়ে গেলেন রূপান্তরপন্থি। তখন জানা গেল, কেউই আসলে সর্বস্ব তো দূরের কথা, কিছুই ত্যাগ করেননি। রুবলের বিনিময়ে রাজনীতি করেছেন, নিজেরা পরিবার নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণে বিদেশে গিয়েছেন, নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের উচ্চশিক্ষার জন্য পার্টির স্কলারশিপ বাগিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে পাঠিয়েছেন। তখন মনা মাস্টারের আর কোনো হিসাবই মেলে না। সঙ্গীদের বলবে কী? নিজেরই তো কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা নেই।

সময় মানুষকে ধীরে ধীরে সবকিছু সয়ে নিতে শেখায়। গত বারো-তেরো বছরে এই ব্যাপারগুলিও সয়ে এসেছে মনা মাস্টারের। এর মধ্যে পার্টির একটা অংশ একটু উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তারা যোগাযোগ করেছিল মনা মাস্টার সাথে। কিন্তু তার দ্বিধা কাটেনি। অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর সে খুঁজে পায়নি বর্তমান নেতৃত্বের কাছ থেকে। তাই আর সেইভাবে যোগযোগটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মনা মাস্টার অ্যাকটিভ হয়ে উঠতে পারেনি। গত বারো-তেরো বছরে কমরেড মনা মাস্টার, লালপতাকা মনা মাস্টার এখন শুধুই মনা মাস্টার।

স্কুলের ক্লাস শুরু হয় এগারোটায়। বাড়ি থেকে সাড়ে দশটায় বেরুলেই চলে। গোসল সারতে সারতেই ফিরোজার ভাত ফোটানো শেষ। বেড়েও ফেলে। গরম ভাত, আলু ভর্তা, মৌসুমি সবজির নিরামিষ। কখনো ডিমভাজা। জুঁইফুলের মতো ভাপওঠা ভাতের থালায় প্রায়ই ফিরোজা দুই চামচ ঘি ছিটিয়ে দেয়। নিয়মিত আহার, নিয়মিত বিশ্রাম, নিয়মিত কাজ। বেশ চেকনাই হয়েছে ইদানীং মনা মাস্টারের চেহারা।

আজকেও খাবারের পরে ঢেঁকুর তুলে মেয়েকে আদর দিয়ে বেরিয়ে আসে মনা মাস্টার। অঘ্রাণ মাসের মোলায়েম ছায়া-ছায়া রোদে হেঁটে স্কুলে পৌঁছুতে বড়জোর কুড়ি মিনিট। তাদের পাড়ার শেষ মাথায় মাড়োয়ারির গুদাম, রিক্সাভ্যানের স্ট্যান্ড, ভাতের হোটেল, কাঁচাবাজারের পরে স্কুল। সে কাঁচাবাজার পেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। পেছন থেকে কেউ একজন তাকে ডাকছে– কমরেড! মাস্টার সাব!

ডাক শুনে ফিরে তাকায় মনা মাস্টার। এখনো এই এলাকায় একজনই শুধু তাকে কমরেড বলে ডাকে। আফাজ। হাঁটু ছোঁয়া লুঙ্গি। গায়ের ফতুয়া ময়লা বরাবরের মতোই। কাঁচামাটি রঙের মুখটি আগের মতোই শীর্ণ। মুখে কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শুধু চোখ দুটো চকচকে, উজ্জ্বল। কখনোই ওর চোখে মেঘের ছায়া পড়তে দেখেনি মনা মাস্টার। আফাজ ছিল তাদের পার্টির পূর্ণ সভ্য। একশো ভাগ ক্ষেতমজুর। লেখাপড়া না জানা। এই ইউনিয়নের সেই ছিল একমাত্র ক্ষেতমজুর পার্টির সভ্য।

মনা মাস্টার দাঁড়িয়ে থাকে। কাছে এসে দাঁড়ায় আফাজ। ফতুয়ার পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে এগিয়ে ধরে।

মনা মাস্টার জানে কিসের টাকা। আফাজের মাসিক লেভি। এক মাসের জন্যেও বন্ধ করেনি আফাজ। পার্টিরই যেখানে ঠিক নেই, পার্টির অফিস অনেক দিন বন্ধ ছিল, কাজ কর্ম বন্ধ ছিল, লেভি দেওয়া বন্ধ করেছিল সব শিক্ষিত কমরেড, আফাজ তখনো নিয়মিতভাবে দিয়ে গেছে তার লেভি। তার বারো বছরের লেভি জমা আছে মনা মাস্টারের কাছে। মাস্টার জানে না কী হবে এই টাকা দিয়ে। তবে পার্টি যদি সংগঠিত নাই-ই হয়, তাহলে সব টাকা একেবারে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে আফাজকে। একত্রে একটা বড় অংকের টাকা পেলে খুব উপকার হবে আফাজের। মনে মনে চট করে হিসাব করে। মাসে পাঁচ টাকা হিসাবে বারো বছরে সাতশো কুড়ি টাকা। হোক, এক হাজার পূর্ণ হোক। তখন তুলে দেওয়া যাবে আফাজের হাতে। ততদিন না হয় সঞ্চয় হিসাবেই থাকুক টাকাটা মনা মাস্টারের কাছে। মাস্টার টাকা নিয়ে পকেটে রাখে।

আচ্ছা, আফাজ কি সন্দেহ করে না মনা মাস্টারকে? পার্টির দুরবস্থা, অচলাবস্থার কথা কিছু কিছু তো সে জানে নিশ্চয়ই। সব হয়তো বোঝে না, কিন্তু এখন যে পার্টির কোনো কার্যক্রম নেই, কাজের বিনিময়ে খাদ্যের আন্দোলন নেই, গমচোর চেয়ারম্যান-মেম্বরের বিরুদ্ধে লালপতাকা মিছিল নেই, খাসজমি দখলের আন্দোলন নেই– এসব তো বুঝতে পারে আফাজ। তবু যে সে তার গতরবেচা আত্মার মতো পাঁচটি করে টাকা মাসে মাসে তুলে দিচ্ছে মাস্টারের কাছে, তার কি একবারও সন্দেহ হয় না টাকাটা ঠিক জায়গায় পৌঁছুচ্ছে কিনা? সম্ভবত না। কেননা নেতাকে সন্দেহ করলে পার্টি হয় না। আফাজ সন্দেহ করে না মনা মাস্টারকে। মনা মাস্টার সন্দেহ করেনি তার ওপরের নেতাদের। অথচ বারো বছর আগে সেই নেতারা রাতারাতি পরেছিল বিশ্বাসহন্তার পোশাক। পথ প্রদর্শকরা মেতেছিল পথ ভোলানোর ষড়যন্ত্রে।

কেমন আছো আফাজ? দিনকাল কেমন যাচ্ছে? কাজ-কাম পাচ্ছো?

'কই আর কাজ-কাম কমরেড! আগের দিনের লাকানই একদিন কাম জুটলে তিনদিন নাই। গিরস্ত চাষীর জুটলে তারপরে না কিষান-ক্ষেতমজুরের কাম! তা দ্যাখেন দেখি, চাষীর নিজেরই মরণদশা। পাট বুনে বউঝির গয়না বন্ধক দিয়া, সেই পাটের দর নাই। ধান বুনতে খরচের একশেষ, ধান উঠলে লাভের টাকা যায় ফইড়্যার পকেটে। তাই চাষীরও যে অবস্থা, কিষানেরও সেই অবস্থা। যে গাছের রসে আমরা বাঁচি, সেই গাছই যদি শুকায় যায় আমরা খাই কী?'

তবু তুমি যে মাসে মাসে টাকাটা দিয়ে যাচ্ছো! কষ্ট হচ্ছে না?

কষ্ট হলেও তো টাকাটা দেওয়াই লাগবি।

কেন দিতেই হবে কেন?

বারে, টাকা ছাড়া কি কিছু হয়? বিপ্লব হয়?

চমকে ওঠে মনা মাস্টার। এখনো বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে আফাজ!

০৩.

সকালের প্রথম বাসটাতে আজ কোনো বউনি হয় না।

মনটা একটু দমে যায় বদরে আলমের। দিনের প্রথম বাসে যদি যাত্রীদের কাছ থেকে কোনো চাঁদা না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে যে দিনটা খারাপ যাবে।

দ্বিতীয় বাসটাতে সে তাই বেশ জম্পেশ আয়োজন করে। খুব সকালের বাসে যাত্রী বেশি থাকে না। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে পনেরো-ষোলজন নারী-পুরুষ। এই গাড়িতে তাকে বউনি করতেই হবে। সুরেলা গলায় সে সুরা ইখলাস তেলাওয়াত করে বেশ মন দিয়ে। তারপর গলার আওয়াজ এক পর্দা চড়িয়ে আবেদন জানায়– প্রিয় মমিন মুসলমান ভাইসব, যাত্রী মা-বোনেরা আমার, এই গঞ্জে বেহেশতী নূর মসজিদ নামে তৈয়ার হচ্ছে একটা আল্লার ঘর। আল্লার অসীম রহমতে, আপনারে দশজনের উছলুতে মজ্জিদের অদ্ধেক কাম কমপ্লিট হয়া গেছে। অজুখানা হয়া গেছে। হুজরাখানাও হইছে। কিন্তু এখনো অনেকখানি বাকি। মেঝে বাকি দেওয়ালের চুন-সুরকি বাকি, দরজা-জানালা বাকি, আর মিনার, যে মিনার থাক্যা দিনে পাঁচবার আল্লার নামে মানুষকে নামাজের জন্যে ডাকা হবি, সেই মিনারের কাজ বাকি। সেই জন্যে আল্লার আদেশে আপনাদের কাছে আমি আল্লার ঘরের জন্যে আসি। যে যা পারেন আল্লার ঘরে দান কর‍্যা যাবেন। এই দান সদকায়ে জারিয়া। কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবি এই দানের ছওয়াব। যতদিন এই মজ্জিদ থাকবি, ততদিন দাতার রুহের উপর এই দানের ছওয়াব পৌঁছাতে থাকবি। তাই ভায়েরা আমার, মায়েরা আমার যে যা পারেন দ্যান।

কিন্তু কেউ হাত বাড়ায় না।

মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে বদরে আলম। আজ হলোটা কী! সে মরিয়া হয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যায় প্রতিটি যাত্রীর দিকে। কারো মধ্যে পকেটে হাত ঢোকানোর লক্ষণ দেখা যায় না। সুরেলা গলায় আরো তিনটি

আয়াত তেলওয়াত করে বদরে আলম। বলে– এই দানের উছলুতে আল্লা আপনারে যাত্রাপথে ছহি-ছালামতে পৌঁছায় দিক! দ্যান ভায়েরা মায়েরা দান করেন মজ্জিদের জন্যে।

একজনের মন একটু নরম হয়েছে মনে হয়। সে পকেটে হাত দিয়ে একটা দুই টাকার নোট বার করে। দ্রুত তার কাছে পৌঁছে যায় বদরে আলম। হাত বাড়ায় টাকাটা নেবার জন্য কিন্তু লোকটা টাকা দেয় না তার হাতে। বলে– হুজুর রসিদ দ্যান!

রসিদ! একটু থমকায় বদরে আলম। তার বাম হাতে যদিও রসিদ বই আছে। তবু সে রসিদ দিতে চায় না। স্মিত হাসে যাত্রীটির দিকে তাকিয়ে। বলে– এক টাকা দুই টাকার কুনো রসিদ হয় না ভাইসাহেব। দশ টাকার কমে রসিদ দেওয়া হয় না।

ক্যান?

রসিদ ছাপতে খরচ অনেক। কম টাকায় রসিদ দিলে পোষায় না।

কিন্তু রসিদ ছাড়া তো আমি টাকা দিব না।

ক্যান?

রসিদ না দিলে আপনের হিসাব থাকবি কী কর‍্যা?

এই প্রশ্নের উত্তরে বদরে আলম দার্শনিকের ভঙ্গিতে উদাস স্বরে বলে– যেই সময় দানের টাকা আমার হাতে আসে, সাথে সাথে তা হয়া যায় আল্লার টাকা। আল্লার টাকার হিসাব আল্লাই রাখে।

কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। রসিদ তার চাই। এদিকে মাত্র দুই টাকার জন্যে বদরে আলমও রসিদ দিতে রাজি নয়। সে বোঝায়– আপনে বোধহয় সন্দেহ করতিছেন। আল্লার ঘরের টাকা কেউ কি মাইর‍্যা খাইতে পারে?

লোকটা ঠোঁট উল্টায়– কত জনারে দেখলাম। কত মজ্জিদ কমিটির লোকেরে দেখলাম মজ্জিদের টাকা মাইর‍্যা খাইতে।

তাইলে আপনে রসিদ ছাড়া দান করবেন না।

না।

তাহলে থাকুক। আমি দুই টাকার জন্যে রসিদ দিতে পারব না।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বদরে আলম। দ্বিতীয় গাড়িটাও বউনি ছাড়া চলে গেল। মনটা একটু তেতো হয়ে যায় তার। আজকের দিনটাতে বোধহয় কুফা লেগেছে। সে পাশের চায়ের দোকানে ঢোকে। চায়ে চুবিয়ে চুবিয়ে টোস্ট বিস্কুট খায়। আর মনে মনে গুছিয়ে নেয় পরবর্তী গাড়ির জন্য নতুন বয়ান। দুই-তিনটি বাস এপার-ওপার চলে যায়। কিন্তু সেগুলিতে যাত্রীসংখ্যা কম দেখে এগোয় না বদরে আলম। বেশ কিছুক্ষণ পরে। একটা বাসকে দেখা যায় উপচে পড়া যাত্রী নিয়ে এগিয়ে আসতে। সেদিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে দোয়া পড়ে বদরে আলম– বিসমিল্লাহে আওয়ালুহু ওয়া আখিরুহু। সামনে দাঁড়াতে সে উঠে পড়ে বাসের মধ্যে।

বাসযাত্রী ভায়েরা আমার মায়েরা আমার! আসসালামু আলাইকুম।

ভায়েরা মায়েরা মন দিয়া শুনেন একটা মছলা-মিছাল।

একটা মানুষ আছিল যেন মানুষ না। নরাধম যাকে বলা যায়। সে কুনোদিন কুনো মানুষের উপরে রহম করেনি, কারো সাথে ভালো ব্যবহার করেনি। নিজের ধনরত্ন আছিল বেশুমার। বাড়িভর্তি চাকর-নোকর। তাই তার দাপট সব জাগাত। সে পড়শীর উপর অত্যাচার করে, এর কথা তাক যায়্যা লাগায়, একজনের সাথে আরেকজনের গণ্ডগোল-ফ্যাসাদ তৈরি করে। মানুষ বিপদে পড়্যা তার কাছে হাত পাতলে টাকা দেয় বটে, কিন্তু আদায় করে চড়া সুদ। তার কাছে টাকা নিতে হলে বন্ধক দিতে হয় গয়না-গাটি, সোনা-দানা, ঘটি-বাটি। এহেন লোকের অত্যাচারে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ। তারা আল্লার কাছে ফরিয়াদ করে– খোদা, এই লোকের হাত হইতে তুমি আমাদের বাঁচাও।

সেই দোয়া কবুল হয়্যা যায় রাব্বুল আলামীনের দরবারে। আল্লা একজন ফেরেশতারে হুকুম করে ঐ লোকের মরণের ব্যবস্থা করার জন্যে। সেই ফেরেশতা একটা কালকেউটে সাপ নিয়া ভরে রাখে ঐ লোকটার জোব্বার পকেটে। জোব্বা ঝুলানো আছিল আলনার উপরে। সকালবেলা যখন লোকটা গায়ে দিবি তার জোব্বা, অমনি কালকেউটে ছোবল বসাবি তাক।

পরদিন সকালে হঠাৎ একজন সাহায্যপ্রার্থী আসে লোকটার কাছে। বলে যে মহল্লাত নতুন একখান মসজিদ তৈরি হচ্ছে। আল্লার এ কাজে সাহায্য করেন।

কী যে মনে হয় লোকটার, সে ধাঁ কর‍্যা একখান পাঁচশো টাকার নোট দিয়া দেয় মজ্জিদ বানানোর কাজে। তারপর জোব্বা গায়ে দিয়া চলে নিজের কাজকামে। ফেরেশতা কালকেউটেরে হুকুম দিয়া রাখিছে সুযোগমত দংশন করার জন্যে। কিন্তু সকাল কাটে, দুপুর কাটে, বিকাল কাটে, মগরেবের অক্তও যায় যায়। কালকেউটে ছোবল মারে না লোকটার গায়ে। ফেরেশতা তখন পাকড়াও করে কালকেউটেরে। ক্যান রে তুই দংশন করিস না।

কালকেউটে কেঁদে বলে– কিভাবে আমি দংশন করি? যতবার আমি ঐ নরাধমটাকে ছোবল মারতে যাই, ততবার একখান পাঁচশো টাকার নোট আমার মুখের মধ্যে ঢুকে আটকায় দেয় আমার দাঁতগুলানরে। তখন আর আমার শরীলে কুনো শক্তি থাকে না। আমি যেন অবশ-বিবশ হয়া পড়ি।

ফেরেশতা মাথাত হাত দিয়া ভাবে এ কিসের চক্কর। দিশা-বিশা না পায়্যা ফেরেশতা সেজদা করে আল্লার নামে। বলে– খোদা তুমিই জানো এইসব কী ঘটতিছে!

আল্লা বলে– ফেরেশতা শুনো! ঐ মানুষটা আজ সকালে মসজিদ তৈরির জন্যে পাঁচশত টাকা চাঁদা দিয়াছে। আমি আল্লার দরবারে তার ঐ দান কবুল হইয়া গিয়াছে। ফলে তার সামনে আজ যত বালা-মুসিবত ছিল– আসমানি বালা, জমিনি বালা– সবকিছু হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে ঐ পাঁচশত টাকার নোট।

ভাইসব বলেন– সোবহানাল্লাহ!

বুঝে দ্যাখেন মসজিদে দান করার ফজিলত কত বেশি! আপনেরা আজ এদিকে যাচ্ছেন, সেদিকে যাচ্ছেন, জানি না কারো জন্যে কুনো বালা-মুসিবত অপেক্ষা করতিছে কিনা, যদি বালা-মুসিবত সামনে থাকে, তাহলে হয়তো আপনের ক্ষুদ্র দান কাজ করবি আপনের মুশকিল আসানের।

নতুন বয়ানে কাজ হয় ভালোই। যাত্রীদের দিল নরম হয়ে আসে আর বদরে আলমের হাতে আসতে থাকে একটাকা-দুইটাকা-পাঁচটাকার নোট।

সকালের বাসে বউনি না হবার ক্ষতি পুষিয়ে যায় বদরে আলমের।

০৪.

শরীর-মনের ক্ষত শুকাতে চাও তো সময়ের হাতে তাকে সঁপে দাও। টাইম ইজ দ্যা বেস্ট হিলার। এই আপ্তবাক্য নিজের জীবনেও প্রযোজ্য দেখতে পায় মনা মাস্টার। বারো বছরে তার মনের চোট সেরে উঠেছে অনেকখানি। ধীরে ধীরে সে নিজেকে ব্যস্ত করে তুলেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে প্রাইভেটে ছাত্র পড়ানো। আগে এই কাজটাকে রীতিমতো ঘৃণার চোখে দেখত সে। তার যুক্তি ছিল ক্লাসে যদি যে ফাঁকি না দিয়ে ছাত্রদের ঠিকমতো পড়ায় তাহলে তো আর ছাত্রকে প্রাইভেট মাস্টারের কাছে পড়তে যেতে হয় না। আগে যেসব শিক্ষক প্রাইভেট পড়াত তাদের বিদ্রূপ করত মনা মাস্টার। এখন নিজেই প্রাইভেট পড়ায়। প্রথমে শুরু করার সময় মূল উদ্দেশ্য ছিল সময় কাটানো। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল টাকা বড় দরকারি এবং উপকারি বস্তু। যেভাবেই আসুক না কেন সংসারের অজস্র ছিদ্র বন্ধ করতে টাকা অপরিহার্য উপাদান। এভাবেই বাড়তে থাকে প্রাইভেটে ছাত্র পড়ানোর সংখ্যা। সকালে প্রথম ব্যাচে দশজন। স্কুল ছুটির পরে বিকাল পাঁচটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত আরেক ব্যাচ। সন্ধ্যা সাতটায় মিয়াবাড়িতে সেভেন-এইট পড়ুয়া দুই ভাই-বোন। সব মিলিয়ে এখন মনা মাস্টারের দিন কাটে জমজমাট শিক্ষাবাণিজ্য নিয়ে। খরচও বেড়েছে। ফিরোজার ছোটখাটো কিছু সাধের জিনিস, মেয়ে বড় হচ্ছে তার খরচ, ছোট ভাই কাইউমের ইউনিভার্সিটিতে পড়ার খরচ। আগে ছিল আয়ের চেয়ে ব্যয়ের খাত বেশি। এখন সব মিটিয়ে কিছু উদ্বৃত্তও থাকে। বিভিন্ন ব্যাংকে ডিপিএস খুলে রেখেছে মনা মাস্টার। অর্থ যে মানুষকে কতখানি নিরাপত্তা দিতে পারে ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছে সে।

কাইউমকে ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যে। বুঝে-শুনেই পড়াচ্ছে। ইংরেজিতে পাশ করে বেরুলে কাইউমের অন্তত খাওয়া-পরার

কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। এদেশে স্কুল-কলেজে পাঠ্যসূচিতে ইংরেজি থাকবেই আর যেহেতু তা ছাত্র-ছাত্রীদের গিলে খাওয়াতে হয়, তাই তারা ইংরেজিতে কাঁচা থাকবেই। ফলে ইংরেজি শিখার জন্য, অন্তত পরীক্ষায় পাশটা করার জন্য ইংরেজি মাস্টারের কাছে প্রাইভেট না পড়ে উপায় থাকে না। তাইতো দেখা যায় ইংরেজির মাস্টাররা ব্যাচকে ব্যাচকে ছাত্র পরিয়েও কুলিয়ে উঠতে পারে না। আট-দশ বছরের মধ্যেই বাড়িতে দালান তুলে ফেলে।

কাইউমকে পই পই করে বুঝিয়েছে মনা মাস্টার যে ইউনিভার্সিটির অবস্থা খুব খারাপ। অতএব খুব সাবধানে থাকতে হবে। কোনো ঝামেলায় জড়ানো চলবে না। মিছিল-মিটিং আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে দূরে থাকতে হবে। হলগুলোতে সিট পেতে হলে ছাত্র সংগঠনে নাম লেখাতে হয় বলে মনা মাস্টার বলে দিয়েছে কাইউমের হলে থাকার দরকার নেই। শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেস করে থাকে অনেক ছেলে। কাইউমকেও সেভাবেই রেখেছে সে। খরচ একটু বেশি পড়লেও হলে থাকলে যেসব ঝামেলায় না জড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় না, মেসে থাকলে সেগুলো অন্তত এড়ানো যায়। ইউনিভার্সিটিতে সেশন জট আছে। চার বছরের কোর্স শেষ হতে সাত বছর লাগে। তা লাগুক তাতে আপত্তি নেই মনা মাস্টারের। কিন্তু কাইউম যেন কোনো পরীক্ষায় ফেল করে বাড়তি সময় না লাগায় সেজন্য সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি লিখে নিয়মিত পড়াশোনা করার কথা মনে করিয়ে দেয়।

মনা মাস্টার জানে না যে কৈশোরে সে-ই ছিল কাইউমের হিরো। বড় ভাইয়ের সেই সময়কার তেজোদীপ্ত ছবি কাইউমের মনের ওপর চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে রেখেছে। বড় ভাইকে দেখেছে সে লাল পতাকা হাতে খেটে খাওয়া মানুষ আর ক্ষেতমজুরদের মিছিলের সামনে। দেখেছে গাঁয়ের যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। রাত জেগে পোস্টার লিখতে দেখেছে। সাধারণ মানুষের জন্য তার ভাইয়ের হৃদয় নিংড়ানো দরদ, নিজের বিপদের তোয়াক্কা না করে নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্প। সব মিলিয়ে তার মনা ভাই-ই ছিল কাইউমের চোখে আদর্শ মানুষের প্রতিচিত্র।

সেটাই তাকে এখন একটা বাম ছাত্র সংগঠনে ঠেলে দিয়েছে।

দেশে বামপন্থিদের সংগঠন এখন খুবই দুর্বল। ছাত্র সংগঠনের অবস্থাও সেই রকম। এককভাবে কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার মতো সাংগঠনিক শক্তি নেই। অন্যদিকে ডানপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলোর অবস্থা রমরমা। অঢেল টাকার স্রোত বয়ে যায়। ছাত্রনেতারা ছাত্র অবস্থাতেই ঠিকাদারি করে। একেকটা মার্কেট একেক ছাত্রনেতার দখলে। তারা যখন খুশি, যত খুশি চাঁদা তুলে নিয়ে আসে। তাদের ক্যাডারবাহিনী প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে ঘোরে। ইচ্ছেমতো একে-তাকে মারধর করে।

কাইউম ছাত্র হিসাবে মোটামুটি ভালো। তাই শুরুতেই তাদের নজরে পড়ে গিয়েছিল। বড় সংগঠন থেকে ভালো পদ এবং সুযোগ-সুবিধার অফারও এসেছিল। কিন্তু টলাতে পারেনি। কাইউম যোগ দিয়েছে জৌলুশহীন বাম সংগঠনে।

০৫.

মাগরিবের নামাজের পড়ে আর চাঁদা তোলে না বদরে আলম। সন্ধ্যার পরেও দুই-চারটা বাস চলে বটে কিন্তু সেগুলিতে যে ক'জন যাত্রী থাকে তারা মূলত ঘরে ফেরার তাড়নায় মনে মনে অস্থির হয়ে থাকে। বেশির ভাগ দিনমজুর; যারা শহরে কাজের সন্ধানে যায়, তারাই মূলত ঘরে ফিরে আসে এই বাসগুলিতে। এদের কাছে চাঁদা পাওয়া যায় না। তাই বদরে আলমের ছুটি হয়ে যায় মাগরিবের আজান পড়ার সাথে সাথে। সে ধীরস্থিরভাবে মন দিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়ে, মসজিদে বসে বেশ কিছুক্ষণ তসবিহ গোনে, জেকের-আজকার করে। তারপরে গঞ্জের চায়ের দোকানে চা-বিস্কুট-পান সহযোগে কিছুক্ষণ গল্পগুজব। এশার নামাজ পড়ার পরে মসজিদ কমিটির প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আবদুল মজিদের কাছে চাঁদার টাকা বুঝিয়ে দিয়ে, নিজের কমিশন নিয়ে সোজা ঘরে ফিরে যাওয়া। এই তার মোটামুটি রোজকার রুটিন।

আজ মজিদ হাজির কাপড়ের দোকানে টাকা দিতে গিয়ে শোনে যে হাজি সায়েব মসজিদে। একটু অবাক হয় বদরে আলম। রাতকালে ঐ আধাভাঙা মসজিদে কী করছে হাজি সায়েব!

মসজিদ প্রাঙ্গণ আলোয় আলোময়। পল্লীবিদ্যুতের খুঁটি থেকে লাইন টেনে আলো জ্বালা হয়েছে। সেই আলোতে প্লাস্টারবিহীন দেয়াল আরো প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। পাল্লাবিহীন দরজা দিয়ে দেখা যায় ভেতরে সারি সারি খাটিয়া পাতা। প্রত্যেক খাটিয়ার ওপর একটা করে বেডরোল। মসজিদ প্রাঙ্গণে পঞ্চাশ-ষাটজন মানুষ। গাঁয়ের মানুষ সবাই-সবাইকে চেনে। আশপাশে সাত গ্রামের প্রায় সবাইকে চেনে বদরে আলম। কিন্তু এই মানুষগুলো একটাও তাদের পরিচিত নয়।

কোনো বড় তবলিগি দল এসেছে মনে হয়, মনে মনে ভাবে বদরে আলম। কিন্তু একটু খটকাও লাগে। তবলিগের মানুষজনের কথাবার্তা, চালচলন খুব বিনয়ী হয়। কিন্তু এই দলটির সবাই দাড়ি-টুপিঅলা যুবক হলেও আচরণের মধ্যে একধরনের দম্ভ আর শক্তির প্রকাশ। একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন হাজি আবদুল মজিদ। তাকেও একটু থতমত খাওয়া চেহারাতেই দেখা যাচ্ছে। যেন বুঝতে পারছেন না কী করবেন। তারপাশে গিয়ে দাঁড়ায় বদরে আলম। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে– চাচা এই তবলিগি সায়েবরা কই থেকে আইছে?

হাজি মজিদও নিচুস্বরে বলে– এরা তবলিগ না। ইসলামি মুজাহিদ। বঙ্গভাইয়ের নাম শুনিছো না? এরা বঙ্গভাইয়ের লোক। আইছে সর্বহারা খতম করতে।

তবলিগ না! তাহলে মজ্জিদে ঢুকল ক্যান? আপনে মজ্জিদে থাকতে দিলেন ক্যান?

আরে আমি থাকতে না দেওয়ার কে! থানার ওসি সায়েব নিজে আইছিল। মন্ত্রী নাকি নিজে বঙ্গভাইকে এখানে আসতে কইছেন। আমার ঘাড়ে কয়খান মাথা আছে কও! আমি কিভাবে মন্ত্রীর অর্ডার না শুনে পারি?

লোকজনদের বেশ সুশৃঙ্খল কর্মতৎপর দেখা যায়। দুইজন শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে চুলা বানানোর জন্য। অন্যরা জিনিসপত্র গোছগাছ করছে।

বদরে আলম ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে– বঙ্গভাই কোন জন?

তাঁই ভিতরে আছে।

মানুষডা আসলে কী চাচা?

খুব বড় যোদ্ধা নাকি। প্যালেস্টাইনে ইয়াসির আরাফাতের বাহিনীত আছিল। পরে নাকি আফগানিস্তানে লাদেনের সঙ্গে মিল্যাও আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করিছে।

ইরাকে যায় নাই? সাদ্দাম হোসেনের কাছে?

কিজানি? গেছিল বোধহয়!

অনেক অস্ত্র আছে নাকি চাচা?

আমি তো দেখি নাই। তবে দুইখান বড় বড় কাঠের সিন্দুক দেখছি। ঐগুলানে বোধহয় অস্ত্র ভরা আছে।

একজন লোক কোনো একটা কাজে তাদের পাশ দিয়ে যায়। তড়িঘড়ি তাকে সালাম ঠোকে বদরে আলম– আসসালামু আলাইকুম।

ওয়ালেকুম সালাম ওয়ারহমতুল্লাহ।

লোকটা একটু দাঁড়ায়।

বদরে আলম সমীহের দৃষ্টিতে তাকায় লোকটার দিকে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে– জনাবের বাড়ি কোন জেলায়?

হো হো করে হাসে লোকটা। বলে– আমরা ইসলামের সৈনিক। যখন যেখানে যুদ্ধ সেখানেই যাই। ভুলেই গেছি নিজের বাড়িঘরের কথা।

আরেকজন এগিয়ে আসে তাদের দিকে– হাজি সায়েব কেডা? আপনেরে ডাকতিছে আমাগের সিপাহসালার সায়েব।

জ্বে?

আমাগের নেতা ডাকতিছে আপনেরে। ভিতরে যান।

পায়ে পায়ে ভেতরের দিকে এগোয় হাজি আবদুল মজিদ। তার সাথে সাথে চলে বদরে আলমও।

একটা টুলের ওপর বসে আছে নেতা। ওদের দেখে উঠে দাঁড়ায়। এই লোকই বঙ্গভাই!

একটু হতাশই হয় বদরে আলম। বিশালদেহী একটা লোককে দেখবে বলে আশা করেছিল সে। কিন্তু লোকটা চেহারাতেই মাঝারি গড়নের। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। দাড়ি নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত। কুচকুচে কালো দাড়ি। গায়ের রং কালো। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়েই থমকে যায় বদরে আলম। বুঝে ফেলে লোকটার বিশেষত্ব এখানেই। চোখের মণি নড়ে না বললেই চলে। হাসি ফোটে না চোখে। মরা মানুষের চোখের মতো স্থির, ভাবলেশহীন। ঐ চোখের দিকে তাকালে অশুভ একটা ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। নিজের অজান্তেই হিম হয়ে যায় বুকের ভেতরটা।

আপনাদের মসজিদের সবকিছু ঠিক আছে হাজি সাহেব। শুধু বাথরুম খারাপ। আপনি এককাজ করুন। রাতেই দুই-তিনজন মিস্ত্রি যোগাড় করুন। সিমেন্ট, বালু যা লাগে যোগাড় করে ফেলুন। রাতের মধ্যেই ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে বাথরুম-ল্যাট্রিন।

নিচু গমগমে গলা। প্রতিটি শব্দ আলাদা করে উচ্চারণ করা। মনে হয় কথাগুলো কানের মধ্যে গেঁথে যায়।

একটু গাঁইগুঁই করে হাজি মজিদ– আমারে গাঁয়ে মিস্ত্রি নাই জনাব। অন্য গেরাম থাক্যা আনাতে হবি। এত রাত্তিরে মিস্ত্রি পাবো কিনা...

তার কথা শেষ হবার আগেই বঙ্গভাই বলে– মিস্ত্রি পেতে হবে। আপনি লোক পাঠান। অন্য জিনিসপত্র যোগাড় করে ফেলুন।

কিন্তু!

কোনো কিন্তু নাই। যা বললাম তাই করেন। আর আপনাদের চেয়ারম্যানকে খবর পাঠানো হয়েছে? সে এখনো আসছে না কেন? আপনি তাকেও খবর দেবেন। আজ রাতেই যেন দেখা করে আমার সাথে।

জ্বী, জ্বী!

যান। এখানে আপনার থাকার দরকার নাই। যা যা করতে বললাম, সেই কাজগুলি ঠিকঠাক করবেন। যান।

তার সামনে থেকে সরে আসতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে হাজি মজিদ আর বদরে আলম।

০৬.

পরদিন ফজরের অক্তে বদরে আলম সচকিত হয়ে শোনে, নতুন একটা আজান হচ্ছে। তার বাড়ি থেকে তিনটে মসজিদের আজান শোনা যায়। আজ শোনা গেল চারটি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বদরে আলম ভেবেই পায় না চতুর্থ আজানের ধ্বনি কোন মসজিদ থেকে আসছে। সে উঠে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে আজানের শব্দ লক্ষ্য করে। কিছুদূর এগিয়েই সে বুঝতে পারে এই আজানটা আসছে গঞ্জের নির্মীয়মাণ মসজিদ থেকে, যার জন্য চাঁদা তোলে সে। একটু আশ্চর্য হয় সে। মসজিদে আজান দিয়ে নামাজ পড়া শুরু করা মানে মসজিদের কার্যক্রম চিরস্থায়ীভাবে শুরু করা। সেখানে যারা এই মসজিদ বানাল, এই গাঁয়ের মানুষ, তারা কিছুই জানল না! বহিরাগত একদল মানুষ নিজেরা মসজিদে ঢুকে নিজেদের ইচ্ছামতো কার্যক্রম শুরু করে দিল! এতো সাধারণ ভব্যতাতেও মেলানো যায় না। অভিমানে ফুলে ওঠে তার বুক। এই মসজিদের জন্য গত ছয়টা মাস যাবৎ কী পরিশ্রমই না সে করছে! অথচ মসজিদে আজ প্রথম নামাজ শুরু হতে যাচ্ছে একথা কেউ তাকে জানাল না। অন্তত হাজি আবদুল মজিদের উচিত ছিল তাকে জানানো। তবু যেহেতু আজান হয়ে গেছে, সে এই মসজিদেই নামাজ পড়ার জন্য অজু করে রওনা দেয়।

মসজিদের দরজার কাছে যেতেই আবার হোঁচট। মসজিদ চত্বর ঘিরে টহল দিচ্ছে বঙ্গভাইয়ের লোকজন। তারা বাধা দেয় বদরে আলমকে– না জনাব, এই মসজিদে নামাজ পড়বে শুধু মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যরাই। অন্য লোকের জন্য এই মসজিদে প্রবেশ নিষেধ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় বদরে আলম দেখল নামাজ শুরু হতে যাচ্ছে। ইমামতি করছে বঙ্গভাই। অথচ পাহারাদার কেউ নামাজে শরিক হচ্ছে না। সে জিজ্ঞেস করেই ফেলে– আপনেরা নামাজ পড়বেন না?

আমরা পরে জামাত করে পড়ব। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে নেতা ও অন্য সাথীদের পাহারা দেওয়া। তবে আমরা যখন নামাজ পড়ব, অন্যেরা পাহারা দেবে আমাদের।

বেলা দশটার দিকে শুরু হলো বঙ্গভাইয়ের দলের মিছিল। সে মিছিল দেখে ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে গাঁয়ের মানুষের। মিছিলের মানুষের সাজসজ্জা দেখে মনে হচ্ছে তারা যুদ্ধে যাচ্ছে।

সবার সামনে বঙ্গভাই। পায়ে বুট, পরনে কাবুলি ড্রেস, মাথায় টুপি। হাতে খাড়া আকাশের দিকে মুখ করে ধরে রাখা নাঙা তলোয়ার।

মিছিলের অন্যদের কারো হাতে ছোরা, কারো হাতে বল্লম।

নারায়ে তকবির, আল্লাহ্ আকবর!

আল্লাহু আকবর বলার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রগুলো উঁচু হয় আকাশের দিকে। সেগুলোর ফলায় রোদ ঠিকরে পড়ে এসে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামবাসীদের চোখ। ভীতি-বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে গ্রামের মানুষ। এমনটি এর আগে কেউ কোনোদিন দেখেনি।

সব মতবাদ আজকে শেষ, বঙ্গভায়ের বাংলাদেশ।
জেহাদ জেহাদ জেহাদ চাই, জেহাদ করে বাঁচতে চাই।
বিপ্লব বিপ্লব, ইসলামি বিপ্লব।
একটা-দুইটা কাফের ধরো, সকাল-বিকাল নাস্তা করো।
একটা-দুইটা বেদ্বীন ধরো, সকাল-বিকাল নাস্তা করো।
আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান।

গাঁয়ের পথ ধরে মিছিল যায় আর মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে মিছিলের পেছনে পেছনে যাচ্ছিল। কুকুরের কাছেও তো জিনিসটা অভূতপূর্ব। গাঁয়ে সচরাচর মিছিল জিনিসটিই অচেনা। গাঁয়ে মিছিল বলতে যা হয় তা ভোটের সময়। হাতি-ঘোড়া সাজানো ব্যান্ডপার্টি নিয়ে মিছিল। এমন জঙ্গি মিছিল গাঁয়ের কুকুর দেখবে কোত্থেকে। সে তাই ঘেউ ঘেউ করেই যাচ্ছিল। মিছিল থেকে বঙ্গভাইয়ের একজন লোক কুকুরটাকে একবার তাড়ানোর চেষ্টা করে– এই যা ভাগ!

কিন্তু কুকুর পিছু ছাড়ে না মিছিলের। একটু দূরত্ব বজায় রেখে সে মিছিলের পেছনে চারপায়ে হাঁটে আর ঘেউ করে। হঠাৎ একজনকে দেখা যায় হাতের বল্লমটা সাঁই করে কুকুরের দিকে ছুঁড়ে মারতে। মুহূর্তে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়। বল্লমটা ঢুকে পড়ে কুকুরের গলার পাশ দিয়ে বুকের ঠিক মাঝখানে। তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে কুকুর। লোকটা এগিয়ে এসে হ্যাঁচকা টানে বের করে আনে বল্লম। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। কুকুর তখন হা করে আকাশে মুখ তুলে চিৎকার করছে। এবার লোকটা তার বল্লমের ফলা ঢুকিয়ে দেয় কুকুরের মুখের মধ্যে। চাপ দেয় জোরে। মুখ দিয়ে ঢুকে বল্লমের ফলা বেরিয়ে আসে কুকুরের পেট ছ্যাঁদা করে। নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ধুলায়। লোকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে বল্লম বের করে নেয়। ঘাসের সাথে ঘষা দিয়ে ফলা থেকে রক্ত পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। তারপর যোগ দেয় মিছিলে– আমরা হবো তালেবান...

০৭.

ক্লাস থেকে বেরিয়েই টেন্টের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল কাইউম। পেছন থেকে উর্বী ডাকল– কাইউম শোনো!

একেবারে থেমে দাঁড়াল না কাইউম। তবে চলার গতি কমিয়ে দিল। তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে– কী?

একটু শোনো। কথা আছে।

দ্রুত হেঁটে তার দিকে আসার চেষ্টা করছে উর্বী। করিডোরে সদ্য

ক্লাসভাঙা ছেলে-মেয়েদের ভিড়। তাই খুব জোরে হাঁটতেও পারছে না। এগিয়ে না গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কাইউম। কাছে এসে দাঁড়াল উর্বী। এইটুকুতেই হাঁপিয়ে গেছে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কী বলবে বলো!

কোথায় যাচ্ছ?

একটু বিরক্ত হলো কাইউম– যাচ্ছি টেন্টে।

এখনই না গেলে নয়? চলো না আবুর ক্যান্টিনে এক কাপ চা খাই?

ধন্যবাদ! আমার এখন চা খেতে ইচ্ছা করছে না।

চা খেতে ইচ্ছা করছে না, নাকি আমাকে এড়াতে চাইছ?

কী মুশকিল তোমাকে এড়িয়ে চলব কোন দুঃখে! তুমি হচ্ছো যাকে বলে এই ভার্সিটিতে শিক্ষকদের পরে আমার দ্বিতীয় গুরু। তোমার দেওয়া নোট-পত্র পড়েই না আমি পরীক্ষাগুলো পাশ করতে পারছি।

মুখ টিপে হাসল উর্বী– তাহলেই বোঝো, আমার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মাথা নুইয়ে বো করল কাইউম– আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি ম্যাডাম যে, আমি সত্যিই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।

শুধু মুখে বললে চলবে না। কাজে প্রমাণ চাই।

কিভাবে প্রমাণ দেব?

আমার সঙ্গে চা খেতে যেতে হবে।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কাইউম– তথাস্তু! চলো কোথায় নিয়ে যাবে।

চা খেতে খেতে উর্বীকে একটু উন্মনা দেখায়। কাইউম একটু উদ্বিগ্ন হয়– কী ঘটেছে উর্বী?

চায়ের কাপের প্রতি দৃষ্টি রেখে উর্বী বলে– তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কথা আছে।

বলে ফ্যালো।

এখানে নয়। এই ভিড়ের মধ্যে বলা যাবে না। অন্য কোথাও চলো। বকুলতলায় চলো।

এখন? এই সময়ে!

খপ করে ওর হাত চেপে ধরে উর্বী– না করো না প্লিজ। আমাকে একটু সময় দাও। কথা দিচ্ছি আধঘণ্টার বেশি নষ্ট করব না তোমার সময়?

তার সঙ্গে বেরুতে হয় কাইউমের।

বকুলতলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে কয়েকজন ছেলেমেয়ে। ওরা বসে একটা শানবাঁধানো বেঞ্চিতে।

বলো কী বলবে!

উর্বীর যেন কথাটা বলতে খুব বাধছে। বারবার ইতস্তত করছে। হাতের খাতাটা খুলছে আর বন্ধ করছে। কাইউম আবার তাগাদা দেয়– কী যেন বলবে বলছিলে? বলো!

উর্বী যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– তুমি আমাদের সম্পর্কটাকে স্বীকৃতি দিচ্ছ না কেন?

মানে?

আকাশ থেকে পড়ার ভঙ্গি করে কাইউম।

মানে তুমি আমাকে ঝুলিয়ে রাখছ কেন?

কাইউম গম্ভীর হয়– আমি একথারও কোনো মানে বুঝতে পারছি না। এ কথার মাধ্যমে তুমি ঠিক কী বোঝাতে চাইছ?

রেগে ওঠে উর্বী– আমি কী বোঝাতে চাইছি তা তুমি ঠিকই বুঝতে পারছ। শুধু শুধু ন্যাকামি করো না।

আমি ন্যাকামি করছি না। কিন্তু তুমি কোন সম্পর্কের কথা বোঝাতে চাইছ?

এই যে আমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। আমরা যা করছি।

কী করছি আমরা?

কী করছি মানে?

তুমি আমাকে নোট দাও। আমরা মাঝে মাঝে গল্প-গুজব করি। একসাথে চা খাই। সম্পর্ক বলতে তো এটাই।

হতবাক হয়ে পড়ে উর্বী– শুধু এইটুকু!

শুধু এইটুকুই।

আজ পুরো দুই বছর মেলামেশার পরে তুমি এই কথা বলতে পারলে!

সারাজীবন মেলামেশার পরেও মানুষ একথা বলতে পারে। মেলামেশাটা যদি শুধুই মেলামেশা হয় তাহলে না বলতে পারার কী আছে?

তুমি বলতে চাইছ আমাদের মেলামেশা নিছকই মেলামেশা? এর সাথে মানসিক কোনো ব্যাপার জড়িত নেই?

আমার তো তাই মনে হয়।

একেবারে চুপ হয়ে গেল উর্বী। আঘাতটা অন্তরের তলদেশে গিয়ে লেগেছে। ছাইবর্ণ ধারণ করেছে মুখটা। তার মুখ দেখে মায়া হলো কাইউমের। মোলায়েম কণ্ঠে বলল– স্যরি উর্বী আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। আসলে আমি আমাদের মেলামেশাটাকে অন্য কোনোভাবে ভাবিনি। তুমি তো জানো আমার মনজুড়ে আছে সংগঠন। মন জুড়ে আছে অসহায়-নির্যাতিত মানুষের মুক্তির স্বপ্ন।

উর্বীর রুদ্ধকণ্ঠে বলে– আমি তো তোমাকে সংগঠন করতে নিষেধ করিনি। বরং তুমি যাতে সংগঠনে বেশি বেশি সময় দিতে পারো সেই চেষ্টাও করেছি।

হ্যাঁ। তুমি খেটেখুটে আমার জন্য নোট তৈরি করে এনে দিয়েছ। নিজে নোট তৈরি করতে বসলে আমাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হতো। সেই সময়টাতে আমি ভালো করে পড়তে পেরেছি পার্টি লিটারেচার।

তাহলে?

তবুও আমাদের সম্পর্কটাকে আমি কখনো ভালোবাসা বলে ভাবতে পারিনি।

কাইউম দেখল উর্বীর চোখে পানি। সে হাতজোড় করে– আবার আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

উর্বী মুছে ফেলল চোখের পানি। বলল– ঠিক আছে, তুমি টেন্টে যাও।

তুমি বাড়িতে যাবে না।

দুটো দশের বাস ধরে যাব।

তার তো অনেক দেরি। এতক্ষণ কী করবে তুমি?

কিছু করব না। তুমি এখন যাও।

তুমি এখানেই বসে থাকবে?

থাকব। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। তুমি যাও।

খুব রূঢ় হয়ে যাচ্ছে আচরণটা। তবু উঠতে হবে কাইউমকে। পার্টি টেন্টে সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। সাব্বির ভাই আর প্রশান্তদা বসে থাকবে। এমনিতেই দেরি করে ফেলেছে সে। উঠতে উঠতে বলে সে– উর্বী ওঠো। আজ তো আর ক্লাস নেই। চলো তোমাকে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দেই। তুমি বাড়ি চলে যাও।

মুখ নিচু করে বসে থাকে উর্বী।

কাইউম আবার তাগাদা দেয়– কী হলো ওঠো!

মাথা নাড়ে উর্বী– আমি এখন বাড়ি যেতে পারব না। প্লিজ তুমি যাও।

উর্বীকে এখানে একা রেখে চলে যাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারে না কাইউম। আবার বসে থাকলে যদি ফের প্রেমসংক্রান্ত কিংবা হৃদয়সংক্রান্ত আলাপ যদি উঠে পড়ে সেটাকে সামাল দিতে পারবে কিনা সে ব্যাপারেও নিশ্চিত নয় সে। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়ে।

টেন্টে বসে আছে কয়েকজন। ওদের সংগঠনে কর্মী-সদস্যের সংখ্যা কম। কিন্তু যারা আছে, সবাই খুব উৎসাহী কর্মী। এদের কাছে এলে মনের সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে কাইউমের। আলোচনা চলছিল চীনের পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন নিয়ে। প্রবল আগ্রহ নিয়ে আলোচনায় ঢুকে পড়ে কাইউম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই টের পায় তার মনোযোগের সুতো বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছে। প্রশান্তদা টেবিলটকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা। বোঝানোর কায়দা অসম্ভব ভালো। কথা বলার এক চৌম্বক শক্তি আছে তার। কাইউম বেঞ্চিতে বসার সময় তার দিকে একবার তাকাল প্রশান্তদা। মাথা ঝাঁকিয়ে স্বাগত জানিয়েই ফের ফিরে গেল নিজের বক্তব্যে–

মাথাপিছু জাতীয় আয়ে চীন পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোরই কাতারে। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে বর্তমান পৃথিবীতে চীনই একমাত্র দেশ যেটি সামরিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক দিক দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল নয়। চীনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে শুধু এই আশঙ্কাতেই উত্তর কোরিয়ার সমাজতন্ত্রী সরকারের ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানতে পারছে না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো

চীনও কিউবা এবং উত্তর কোরিয়াকে কিছুটা সাহায্য এবং নৈতিক মনোবল যোগায়।

চীনের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে বিগত ২৫ বছরে। কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যাকে স্বনির্ভরতার কাঠামো বলা হয় তা অটুট রয়েছে মাও সে তুং-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত। সবাই জানে, ও দেশে জাতীয় আয় ১৯৬৫ সাল থেকে অভূতপূর্ব গতিতে রয়েছে। এই আয় বাড়ছে জাতীয় সঞ্চয়ের ওপর ভিত্তি করে। বিদেশী ঋণ বা বিনিয়োগের মাধ্যমে নয়। কেননা জাতীয় সঞ্চয়ের হার বিনিয়োগের চেয়ে বেশি। দ্বিতীয় লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাদের রপ্তানির অংক আমদানির চেয়ে বেশি। তৃতীয়ত বিদেশী ঋণের বোঝা এখন ১৭,০০০ কোটি ডলার হলেও সরকারের রিজার্ভ কারেন্সির পরিমাণ ৪০,০০০ কোটি ডলারেরও বেশি। মনে রাখতে হবে যে, মার্কিন সরকার তার বাজেট ঘাটতি এবং চলতি খাতে পরিশোধন বিবরণীতে ঘাটতি মেটাতে মূলত নির্ভর করছে জাপান ও চীন সরকারের প্রদত্ত ঋণের ওপর। চীন-জাপান যদি মার্কিন সরকারের ট্রেজারি বন্ড কেনায় বিরত হয় তাহলে আমেরিকাসহ বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়বে। মূলত চীনের সরকারি তথ্য অনুসারে সে দেশে এখন প্রত্যক্ষ বিদেশী পুঁজির পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের ১৫ শতাংশ। এটি একটি উদ্বেগের কারণ। কারণ ক্রমবর্ধমান বিদেশি পুঁজি এবং স্থানীয় পুঁজি ভবিষ্যতের চীনের সমাজকাঠামো ভেঙে ফেলতে পারে।

এখন আমরা যে বলছি, বর্তমানে চীনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নেই, তা কেন বলছি? সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেখানে শোষণের কোনো সুযোগ থাকবে না। অথচ চীনের বর্তমান অর্থনীতিতে শোষণের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিভাবে?

১৯৭৮-৭৯ সালে দেং জিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি দুইটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যার ফলে অর্থনীতিতে বিরাট মাপের পর্বান্তর ঘটে। প্রথমটি হলো গ্রামাঞ্চলের কমিউন ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে 'পারিবারিক দায়িত্বে'র ভিত্তিতে জমির পুনর্বণ্টন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল বিদেশি পুঁজির জন্য 'খোলা দরোজা' নীতির প্রবর্তন।

এই দুই নীতি আসলে সমাজতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত। এই নীতির মাধ্যমে চীন সরকার বিদেশী পুঁজিকে নানাভাবে শোষণের সুযোগ করে দেয়। যেমন আয়কর বাবদ বিদেশি পুঁজির উদ্যোগ দীর্ঘকাল ধরে কর ছাড় পায়, যেটা অনেক পুঁজিবাদী দেশেও অকল্পনীয়। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতি হচ্ছে, ঐসব উদ্যোগে চীনা শ্রমিকরা সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেখানে শ্রমিকরা মাত্র ২ ডলারের বিনিময়ে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য। যেখানে বাংলাদেশের একজন নির্মাণমিস্ত্রী ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করে পায় দেড়শো টাকা বা ২.৩ ডলার। অথচ আইনত চীনে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টায় ৪ ডলার। কিন্তু বিদেশি পুঁজি যে সমস্ত কারখানায় খাটছে, সেগুলোতে এই আইনের কোনো প্রয়োগ নেই। ফলে, পশ্চিম ইউরোপের শিল্প উন্নয়নের প্রথম পর্বে অর্থাৎ ১৮৫০ সালের আগে শ্রমিকরা যেভাবে শোষিত হতো, আজকের চীনে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে এই ২০০৫ সালে।

কাইউম সবিস্ময়ে খেয়াল করে যে আলোচনায় তার মন নেই। তার মনে ভাসছে শুধু উর্বীর কান্নাভেজা দুটি চোখের ছবি। উর্বী কি এতক্ষণ বাড়িতে ফিরে গেছে? অকস্মাৎ কাইউমের বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি হয় যা আগে কখনো হয়নি। মনে মনে উর্বীবিহীন দিনযাপনের কথা কল্পনা করে কাইউম। কিন্তু মন অন্য কথা বলে। জানায় যে উর্বীবিহীন দিনযাপন তার পক্ষে আর কখনোই সম্ভব হয় না।

কাইউম চট করে উঠে দাঁড়ায়। কাউকে কিছু না বলে টেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসে। বকুলতলায় যায়। উর্বী নেই। ক্যান্টিনে যায়। লাইব্রেরিতে যায়। উর্বী কোথাও নেই। বোধহয় হলে গেছে কোনো বান্ধবীর সঙ্গে। আহা মেয়েটা বোধহয় কান্নাকাটি করছে খুব। প্রত্যাখানের কষ্ট তো মানুষকে মরণযন্ত্রণা দেয়। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয় কাইউমের।

সে বাসস্ট্যান্ডে আসে। ঘড়ি দেখে। প্রায় দুটো বাজে। চকিতে মনে হয় উর্বী আগের বাসেই চলে যায়নি তো। তাহলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে! মেয়েদের বাসের দিকে এগিয়ে যায় কাইউম। বাসের মধ্যে, বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে মেয়েরা। তাদের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায় কাইউম। মেয়েরা তার ভাবভঙ্গি লক্ষ করে হাসে। কেউ মুখটিপে, কেউ কেউ উচ্চস্বরে। দুই-একটা মন্তব্যও ছিটকে আসে। কাইউম ভ্রূক্ষেপ করে না। সে উর্বীকে দেখতে পায় বামদিকের জানালায় মাথা নিচু করে বসে আছে। কাইউম জানালার কাছে যায়, কাচে টোকা দেয়। ডাকে– উর্বী!

উর্বী একটু চমকে উঠে তার দিকে তাকায়। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করে– কী?

নেমে এসো। কথা আছে।

উর্বী নেমে আসে। একটু অনিচ্ছার ভাব নিয়ে। কাইউম কেয়ার করে না।

উর্বী কাছে এসে জানতে চায়– কী?

একটা খুব জরুরি কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।

কী?

আমি তোমাকে ভালোবাসি উর্বী!

০৮.

পরদিন হাইস্কুল মাঠে জনসভা হয়। বঙ্গভাইয়ের জনসভা।

জেলা সদর থেকে এক ভ্যান পুলিশ এসে দাঁড়িয়ে ছিল জনসভার পাশের রাস্তায়।

গাঁয়ের পুরুষরা প্রায় সবাই আসে জনসভায়। আসতে বাধ্য হয়। কেননা বাড়ি বাড়ি আগেই খবর পৌঁছে গেছে যে এখন এই এলাকায় বসবাস করতে হলে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। সেই নিয়মগুলো বলে দেওয়া হবে জনসভায়। গ্রামের সরকারি দলের লোকেরা যোগ দিয়েছে বঙ্গভাইয়ের সাথে। তারাই অনেক অনেক অনুরোধ করে বঙ্গভাইকে এনেছে এই এলাকায়। চেয়ারম্যান-মেম্বাররা পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে আছে। সাধারণ মানুষ তো ভয় পাবেই।

জনসভায় দাবি করা হয় যে, এই এলাকা সর্বহারা পার্টির ক্যাডারে ছেয়ে গেছে। সর্বহারা হচ্ছে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। তারা কমিউনিস্ট। আল্লা-খোদা মানে না। ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন। তারা মানুষের জান-মাল কেড়ে নেয়। অতএব সর্বহারাদের খতম করতে হবে। জনসভায় মাইকে দাঁড়িয়ে বঙ্গভাই বলে– আমি সর্বহারা যারা আছো তাদেরকে একটা সুযোগ দিতে চাই। আগামীকাল মাগরিবের অক্ত পর্যন্ত তোমোদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো। এই সময়ের মধ্যে যারা আমাদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করবে, তওবা করবে, তাদের প্রাণভিক্ষা দেওয়া হবে। আগামীকাল সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হবে সর্বহারা নির্মূল অভিযান। তখন আর কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

জনসভা থেকে গাঁয়ের নারী-পুরুষ, সকল প্রাপ্তবয়স্কদের নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হলো। নারীরা বোরখা ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। পুরুষদের দাড়ি রাখা বাধ্যতামূলক। রাস্তায় বা বাহিরে বেগানা নারী-পুরুষ বাক্যালাপ করতে পারবে না।

আবার মনে করিয়ে দেওয়া হলো, কেউ যদি কোনো সর্বহারাকে কোনোভাবে সহযোগিতা করে তাহলে তার রেহাই নেই।

০৯.

কলেজ থেকে ফিরছিল রফিক।

হাত ইশারায় তাকে ডাকল বঙ্গভাইয়ের চার লোক। কাছে এসে বিনীত ভঙ্গিতে সালাম দিল রফিক– আসসালামু আলাইকুম!

সালামের উত্তর না দিয়ে একজন জিজ্ঞেস করল– তোমার নাম রফিক?

জ্বী।

তুমি আওয়ামী লীগের সেকান্দার আলীর ভাতিজা?

জ্বী।

তোমাগের বাড়িতে মাঝে মাঝে বাইরে থাকি মানুষজন আসে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু থতমত খায় রফিক। সব বাড়িতেই তো অন্য জায়গা থেকে আত্মীয়-স্বজন-বান্ধব-পরিজন আসে। সে তাই কী বলবে বুঝতে পারে না।

উত্তর দাও না ক্যান?

জ্বী আত্মীয়-স্বজন আসে মাঝে মাঝে।

আমরা আত্মীয়-স্বজনের কতা বলিচ্ছি না। বলিচ্ছি অন্য লোকের কথা।

অন্য লোক মানে?

রফিক অবাক হয়। কিন্তু তার অবাক হওয়াকে পাত্তা দেয় না বঙ্গভাইয়ের লোকেরা। একজন বলে তার সাথীদের উদ্দেশ্য করে– মাল সেয়ানা আছে রে! ভালোই প্যাঁচ খাটাচ্ছে।

এবার সে রফিকের দিকে ফিরে বলে– চলো!

কোথায়?

আমাগের নেতার কাছে।

কেন? গলা কেঁপে যায় রফিকের– আমি কী করিছি?

সিডা বুঝায়ে দেবানে চলো।

মসজিদ-চত্বরে একটাই গাছ। মহানিম। দুই মানুষ সমান চওড়া গুঁড়ি। রফিককে নিয়ে এসে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে বেঁধে ফেলা হলো গাছের গুড়ির সঙ্গে। এতটাই আশ্চর্য এবং ভীত হয়ে পড়েছে রফিক কখন যে তাকে বেঁধে ফেলা হয়েছে যেন বুঝতেই পারেনি। তাকে বেঁধে রেখে চলে গেল ওরা মসজিদের ভিতরে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে রফিক। মসজিদের কোমরসমান উঁচু বাউন্ডারি দেয়ালের ওপারে একজন-দুইজন করে বাড়ছে উৎসুক মানুষের ভিড়। পথ চলতে চলতে লোকে এদিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে রফিককে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এল বঙ্গভাই। চার সঙ্গিসহ। তার জনাদশেক লোক অস্ত্র হাতে পজিশন নিয়েছে বাউন্ডারি দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায়। কোনো লোক ভেতরে আসতে চাইলে ঠেকিয়ে রাখবে।

বঙ্গভাই এসে দাঁড়াল রফিকের সামনে। তার ঠোঁটে মৃদু হাসি। হাসিমুখে সে রফিকের সামনে দাঁড়িয়ে রইল মিনিটখানেক। তারপরে কোনো পূর্বাভাষ না দিয়েই চড়াৎ করে চড় কষাল রফিকের গালে।

বাবারে মারে বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল রফিক।

তাকে কাঁদতে দেবার জন্যই যেন কয়েক পা পিছিয়ে এল বঙ্গভাই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রফিকের দিকে চোখ রেখে।

কিছুক্ষণ পরে কান্না থামল রফিকের। মৃদু মৃদু ফোঁপাচ্ছে। চোখে তীব্র আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে বঙ্গভাইয়ের দিকে।

বঙ্গভাই এবার কথা বলে। জিজ্ঞেস করে রফিককে– তোর সাথে সর্বহারাদের যোগাযোগ আছে। তুই সর্বহারা।

না। বিশ্বাস করেন হুজুর। আল্লার কসম!

খবরদার! ঐ নাপাক মুখে আল্লার নাম উচ্চারণ করবি না।

বিশ্বাস করেন হুজুর! আমি পার্টি করি না। পার্টি করে আমার চাচা।

তোর চাচা যে আওয়ামী লীগের চাঁই সে আমি জানি। ব্যাটাকে হাতে পেলে ছাড়ব না। কিন্তু তুই যে ব্যাটা সর্বহারা করিস তার কী হবে?

আমি সর্বহারা করি না।

করিস না? তাহলে গত মাসে রাতে সর্বহারার নামে পোস্টার লাগিয়েছিল কে?

আমি জানি না।

সর্বহারার নেতা আর্টিস্ট বাবুকে চিনিস না?

না হুজুর।

ফের মিথ্যা কথা! বল এই গাঁয়ে আর কে কে সর্বহারার দল করে।

আমি জানি না হুজুর।

হতাশভঙ্গিতে ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলায় বঙ্গভাই। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে– ভেবেছিলাম দোষ স্বীকার করলে তোকে অল্প শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব। কিন্তু তুই নিজেকে খুব বেশি সেয়ানা ভাবিস। সোজা ভাবে তুই কথা বলছিস না। এখন তাহলে আমাকেও বাঁকা হতে হবে।

সঙ্গিদের ইশারা করে মসজিদের ভেতর ঢুকে পড়ল বঙ্গভাই।

শুরু হলো মার। চারজন ঝাঁপিয়ে পড়ল রফিকের ওপর। একজন রড দিয়ে পেটাচ্ছে। একজন হাতুড়ি দিয়ে মারছে হাত-পায়ের জয়েন্টগুলোতে। বাকি দু'জন লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মেরে চলেছে। রফিকের চিৎকারে শত শত লোক জমে গেছে মসজিদ চত্বরের সামনে। কয়েক মুহূর্ত পরে নাক-মুখ থেকে গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। রক্তে মাখামাখি রফিককে এখন আর চেনার উপায় নেই।

শত শত লোক দু'চোখে নগ্ন আতঙ্ক নিয়ে দেখছে এই নির্মম অত্যাচার। টুঁ শব্দ করার সাহস পর্যন্ত কারো নেই। হঠাৎ মসজিদ থেকে আবার বেরিয়ে এলো বঙ্গভাই। হুংকার ছাড়ল সমবেত লোকদের দিকে তাকিয়ে– এই হারামজাদা সর্বহারা পার্টি করে। সর্বহারার নামে পোস্টার লাগায়। আমার কাছে পাকা খবর আছে। সুযোগ দিয়েছিলাম আত্মসমর্পণের। তওবা করে ইসলামের পথে ফিরে আসার। কিন্তু আমার কথার কোনো মূল্য দেয়নি ওরা কেউ। আজ থেকে শুরু হয়ে গেছে আমার সর্বহারা নির্মূলের অভিযান। সবকটাকে ধরব। জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল বদরে আলম। ইচ্ছা করে, সে একবার বঙ্গভায়ের সামনে যায়। গিয়ে বলে যে গ্রামের মানুষ রফিক সম্পর্কে জানে। তার স্বভাব-চরিত্র ভালো। ওদের পরিবারটি আওয়ামী পরিবার হলেও রফিককে কখনোই পার্টি-পলিটিক্সে দেখা যায়নি, তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

কিন্তু সাহস করে সামনে পা বাড়াতে পারে না বদরে আলম।

পরদিন সকালে রফিকের লাশ পাওয়া গেল এখান থেকে তিন মাইল দূরে উল্টাডাঙার বিলের মধ্যে। একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা। উপরদিকে পা, মাথা নিচে।

১০.

ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল কাইউম। জানালা দিয়ে দেখল মেসের গেট দিয়ে ঢুকছে বড়ভাই। চট করে আবার ঘড়ি দেখল কাইউম। সাড়ে আটটা বাজে। এত সকালে এখানে এসে পৌঁছেছে বড় ভাই। তার মানে হচ্ছে ভোরে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় মনে হচ্ছে। দরজার দিকে এগিয়ে গেল কাইউম। তাকে দেখে একটু হাসি ফুটল মনা মাস্টারের মুখে। দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনো সম্ভাষণ বিনিময় হয় না কোনোকালেই। এসব আনুষ্ঠানিকতা থেকে অনেক গভীরের সম্পর্ক দুজনের। ঘরে ঢুকে ধপ করে চেয়ারটায় বসে পড়ল মনা মাস্টার। বলল– একটু পানি দে!

জগ থেকে পানি ঢেলে গ্লাস এগিয়ে দিল কাইউম। কোনো কথা বলছে না। জানে, যা বলার মনা মাস্টার সময়মতো ঠিকই বলবে।

পানি খেয়ে একটা ঢেকুর তুলল মনা মাস্টার।

মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কাইউম– বাড়ির সক্কলে ভালো আছে?

হ্যাঁ বাচক মাথা নাড়ল মনা মাস্টার। তারপরে বলল– বাড়ির সবাই ভালো আছে। আমি খুব ভোরে উঠে ছুটে আসছি শুধু খালি তোর জন্য।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল কাইউম।

তোর এখন গাঁয়ে যাওয়া চলবি না। কোনোমতেই য্যান বাড়িত যাস না!

ক্যান? কী হইছে?

গাঁয়ে আস্তানা গাড়িছে একদল শয়তান। বঙ্গভাই নাম। লাদেন বাহিনীর লোক। পুরা এলাকা এখন তার দখলে। যা খুশি করতিছে। ফরিদরে চিনিস তো?

কোন ফরিদ?

ঐ যে আওয়ামী লীগের সেকান্দর মিয়ার ভাতিজা। কলেজে পড়ত। ফরিদ।

হ্যাঁ হ্যাঁ। কী হইছে ফরিদের?

ফরিদেরে পিটায় মাইর‍্যা ফালাইছে।

ক্যান?

সে নাকি সর্বহারা করত।

অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে যায় কাইউমের– আওয়ামী লীগ বাড়ির ছাওয়াল সর্বহারা করত?

ঐডা আসলে একটা অজুহাত। সর্বহারার নাম কইর‍্যা মানুষ মারার অজুহাত।

তো ফরিদরে পিটায়া মারল, গাঁয়ের লোকে করল না কিছু?

ম্লান হাসে মনা মাস্টার– গাঁয়ের লোকে কী আর করবি। ষাট-সত্তর জন সশস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে গাঁয়ের লোকের কী করার আছে। তার উপর তাদের প্রটেকশন দিচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ! পুলিশ বঙ্গভাইয়ের এইসব কাজে মদদ দিচ্ছে!

খালি পুলিশ না। শুনা যায় আমাদের মন্ত্রী নাকি বঙ্গভাইকে গাঁয়ে আনাইছে।

ক্যান?

মুখে বলতিছে সর্বহারা নির্মূল করার জন্যে। আসলে তার বিরোধী কোনো লোকরে সে গাঁয়ে টিকতে দিবি না। শুন ভাই, গাঁয়ের পরিস্থিতি খুব খারাপ। তুই খরবদার গাঁয়ে যাবি না। এই যে টাকাগুলান ধর।

অনেকগুলো টাকা ধরিয়ে দেয় মনা মাস্টার কাইউমের হাতে– তোর তিনমাসের খরচের মতোন টাকা আছে। শেষ হওয়ার আগেই আমি আবার পাঠাব। তুই আমার চিঠি কিংবা গ্রীন সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত গ্রামে যাওয়ার চিন্তা পর্যন্ত করিস না খবরদার!

ক্যান? আমি গেলে অসুবিধা কী?

ওদের খুব রাগ কলেজ-ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রদের উপর। তার সাথে তুই আবার বাম সংগঠনের সাথে যুক্ত। তোরে বাগে যদি পায়...

কাইউম মাথা নাড়ে– তাহলে তো বিপদ তোমারও।

তিক্ত হাসে মনা মাস্টার– আমারে নিয়া চিন্তা নাই। আমি তো যাকে বলে এখন ডেড হর্স। নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ। মন্ত্রী জানে, গাঁয়ের মানুষও জানে যে আমার দিক থাইক্যা তাদের কোনো ভয়ের কিছু নাই। কিন্তু আবার বলি, তুই ভাই খবরদার গাঁয়ে যাবি না কিছুতেই।

প্রসঙ্গ পাল্টায় কাইউম– তুমি কি নাস্তা খাইছ? নাস্তা আইন্যা দিব?

তা কিছু খাইলে মন্দ হয় না। রাত পোয়ানের আগে একমুঠ মুড়ি মুখে দিয়া রওনা দিছি। তুই আমার জন্যে নাস্তা দিয়া ভার্সিটিতে যা। আমি নাস্তা খায়া একটু ঘুমাব। দুপুরে তুই ফিরলে তারপর না হয় বাড়ির দিক রওনা দেওয়া যাবি।

১১.

পত্রিকা পড়ে সবিস্তারে জানা যায়।

ঘটনার বিবরণ যথেষ্ট লোমহর্ষক, কিন্তু ঘটনার আড়ালের পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে কাইউম। সরকারি দলের নেতা, পুলিশ এবং বঙ্গভাই যৌথভাবে কাজ করছে বোঝা যায়। কোনো ঠাণ্ডা মাথার ফ্যানাটিক খুনি এমনিতেই বিপজ্জনক, তাকে যদি সাপোর্ট দেয়ার জন্য থাকে পুলিশ, সে হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। এর সঙ্গে সরকারি দলের আশীর্বাদ যোগ হলে হয়ে ওঠে আরো দশগুণ ভীতিপ্রদ। ঠিক সেটাই ঘটছে এখন তাদের গ্রামে। এই খুনিবাহিনীকে ঠেকানোর উপায় কী? মনের চোখে দেখতে পায় একের পর এক লাশ পড়ছে অবরুদ্ধ জনপদে।

সত্যিই লাশ পড়তে থাকে।

পনেরো দিনের মধ্যে চারজন খুন হয়ে যায় বঙ্গভাইয়ের বাহিনীর হাতে।

পত্র-পত্রিকায় যথারীতি খবর প্রকাশিত হয়। সারাদেশে মোটামুটি প্রতিবাদ শুরু হয়। কিন্তু এই জেলার পুলিশ কর্মকর্তা সোজাসুজি বলেন যে, বঙ্গভাই বলে কারো অস্তিত্ব তার জানা নেই। তাহলে এই হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করছে কে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, যারা নিহত হয়েছে তারা সবাই কথিত সর্বহারা। এই গ্রামগুলো সর্বহারাতে ছেয়ে আছে। ইদানীং আন্ডারগ্রাউন্ড চরমপন্থি দলগুলোর মধ্যে ভাঙন ধরেছে। আগে যেখানে ছিল দুইটি গ্রুপ, এখন সেখানে রয়েছে কমপক্ষে ছয়টি গ্রুপ। এদের ভাঙনের মূল কারণ হচ্ছে ডাকাতির টাকা এবং চাঁদাবাজির টাকার ভাগ-বাটোয়ারা। এছাড়া এরা বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির হয়ে বন্দুক ভাড়া খাটায়। সেই ভাগের টাকা নিয়েও গণ্ডগোল চরমে। এতদিন ওরা শ্রেণীশত্রু খতমের নামে নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করত। এখন নিজেরাই মরছে মারামারি কাটাকাটি করে।

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে যে, গাঁয়ের নির্মীয়মান মসজিদে একটা কথিত ইসলামি জঙ্গি গ্রুপ ঘাঁটি গেড়েছে। তারা মসজিদকে বানিয়েছে টর্চার চেম্বার। এদের নেতা হচ্ছে বঙ্গভাই। আপনি এদের সম্বন্ধে কী জানেন?

পুলিশ কর্মকর্তা হেসেই উড়িয়ে দেয় এই অভিযোগ। আরে কোনো ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই। ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। সেখানে জঙ্গি গ্রুপ আসবে কোত্থেকে! প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে ঐ গ্রামে কোনো বহিরাগত নেই। বঙ্গভাই-টঙ্গভাই নামে কারো কোনো অস্তিত্বই নেই। গ্রামের লোকেরা সর্বহারার অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ঐ মসজিদকে কেন্দ্র করে তারা সংগঠিত হয়েছে।

আপনি কি নিজে ঐ গ্রামে গিয়েছেন সরেজমিনে তদন্তের জন্য?

পুলিশ কর্মকর্তা হেসে জানালেন যে, তার কর্মক্ষেত্র বিশাল এলাকাজুড়ে। একা তিনি তো আর সব জায়গায় যেতে পারেন না। তাই আজ পর্যন্ত তার সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

সাংবাদিকরা নাছোড়বান্দা। একজন সরাসরি বলে ফেলে, অভিযোগ আছে যে, পুলিশবাহিনী তথা আপনি ঐ বঙ্গভাইয়ের বাহিনীকে মদদ যোগাচ্ছেন।

এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই বলে জানিয়ে দিলেন পুলিশ কর্মকর্তা।

সাংবাদিকরা আবারও অভিযোগ করে যে, বঙ্গভাইয়ের বাহিনী সেখানে পাল্টা প্রশাসন চালাচ্ছে।

তাই কখনো হতে পারে! আকাশ থেকে পড়েন পুলিশ কর্মকর্তা। পাল্টা প্রশাসন চালানো মানে তো সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহিতা। এমন সাহস বাংলাদেশে কারো হবে না।

বঙ্গভাই সেখানে হুকুম জারি করেছে যে প্রত্যেক পুরুষকে দাড়ি রাখতে হবে। প্রত্যেক মহিলাকে বোরখা পরতে হবে।

আরে পর্দা-পুষিদা মানা তো ইসলামের হুকুম। মেয়েদের জন্য পর্দা করা ফরজ। আর পুরুষদের দাড়ি রাখা তো ভালো কাজ। এটা রাসুলুল্লাহর সুন্নত। প্রত্যেক মুসলমানেরই এই প্রথা পালন করা উচিত।

আপনি যে দাড়ি রাখেননি!

সাংবাদিকদের এই কথায় থতমত খেয়ে যান পুলিশ কর্মকর্তা। আমতা আমতা করে বলেন যে, তারপক্ষে নানা কারণে এখনো দাড়ি রাখা হয়ে ওঠেনি। আল্লাহ তৌফিক দিলে ভবিষ্যতে তিনি অবশ্যই দাড়ি রাখবেন।

আপনারা বলছেন যে, ঐ গ্রামে যে পাঁচজন নিহত হয়েছে, তারা সবাই আন্ডারগ্রাউন্ড চরমপন্থি দলের সদস্য। কিন্তু আমরা গ্রামের লোকদের কাছে জেনেছি তারা কেউ সর্বহারা ছিল না।

প্রশ্নের তীর ব্যক্তিগত দাড়ি রাখা থেকে সরে গেছে বলে একটু হাঁফ ছাড়েন পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি একগাল হেসে বলেন যে, গ্রামের সাধারণ মানুষ কিভাবে সর্বহারা চিনবে? সর্বহারার লোকেরা তো আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকে। নিজেদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করে রাখে। তারা এমনভাবে সমাজে মিশে যেন তারা নেহায়েত ভালো মানুষ। তারা একটা অপারেশনে যায়, ফিরে এসে আবার ভালোমানুষ সেজে থাকে– এই কারণেই তো সর্বহারা দমন করা এত কঠিন।

সাংবাদিকরা তবুও চেষ্টা করে। তারা বলে, তাদের কাছে জেনুইন খবর আছে যে, ঐ গ্রামে যত অপরাধ ঘটছে, তার সবগুলির হোতা বঙ্গভাই এবং তার বাহিনী। পুলিশ কর্মকর্তার উচিত নিজে গিয়ে এই কথার সত্যতা দেখে আসা।

পুলিশ কর্মকর্তা আশ্বাস দেন যে সাংবাদিকরা যেহেতু বলছেন তিনি অবশ্যই অকুস্থলে যাবেন এবং অচিরেই যাবেন।

১২.

রোদ খুব চড়া। এত বৃক্ষবহুলতাও ক্যাম্পাসে রোদের আঁচ ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। গাছপালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে সূর্য ঠিকই রৌদ্রবান হেনে চলেছে।

উর্বী বলল– চলো আইসক্রিম খাবো!

ওসব আদুরে আদুরে খাবার আমার চলে না। সাফ জানিয়ে দিল কাইউম।

তাহলে কোক খাবো।

আঁতকে ওঠার ভান করল কাইউম– সর্বনাশ! রক্তচোষা বহুজাতিক কোম্পনিকে টাকা দেব আমি! আমি কোনোসময়ই কোকাকোলা-পেপসি খেতে রাজি নই। ওগুলোর চাইতে আমার বেলের সরবত ঢের উপাদেয়।

ও, কোক খাওয়ার কথা উঠলে বহুজাতিক কোম্পানি আসে। আর সিগারেট খাওয়ার সময়? তোমার গোল্ডলিফ, বেনসন, ফাইভ ফিফটি ফাইভ বহুজাতিক কোম্পানির নয়?

অবশ্যই বহুজাতিক কোম্পানির। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি ম্যাডাম যে, আমি ঐসব ব্রান্ডের সিগারেট খাই না। আমি খাই দেশে তৈরি সিগারেট।

যেগুলো আরো নিম্নমানের এবং স্বাস্থ্যের জন্য আরো বেশি ক্ষতিকর।

বাজে কথা। সিগারেটে যেটুকু ক্ষতি তা সব সিগারেটেই সমান।

ক্ষতির কথা যদি জানোই তাহলে খাও কেন মশাই?

এটা অবশ্য একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্ন করছে। তবে উত্তরটা আমি ঠিকমতো দিতে পারব না। অন্তত যে উত্তর দেব তা তোমার কাছে সন্তোষজনক মনে হবে না।

আসলেই তো সিগারেট খাওয়ার পেছনে কোনো সন্তোষজনক যুক্তি নেই। যাকগে, আমাদের আলোচ্য বিষয় সিগারেট নয়, কোক খাওয়া। চলো কোক খাব।

বলেছি তো আমি খাব না।

আহা একদিন খেলে বহুজাতিক কোম্পানির কাছে তোমার দেশ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে না।

হঠাৎ-ই গম্ভীর হয়ে পড়ে কাইউম। থমথমে গলায় বলে– ছোট ছোট ত্রুটি থেকেই বড় পদস্খলনের সূচনা হয় উর্বী। তুমি খেতে চাও খাও। আমাকে খাওয়ার জন্য জোর করো না।

কাইউমের গম্ভীর হয়ে যাওয়া চোখ এড়ায় না উর্বীর। হালকা হাসির ভঙ্গিতে বলে– আচ্ছা বাবা খাবে না কোক, খাবে না! এতে এত রেগে যাওয়ার কী হলো? আমিও খাব না।

না তুমি অবশ্যই খাবে। চলো।

আমি খাব না।

অবশ্যই খাবে। খেতে হবে তোমাকে। গোঁয়ারের মতো বলে কাইউম।

উর্বীর মুখ একটু শুকিয়ে যায়। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না কাইউম। তাড়া লাগায় উর্বীকে– চলো!

দোকানে ঢুকে নিজেই কোকের অর্ডার দেয় কাইউম। উর্বীর হাতে ধরিয়ে দেয় কোকের বোতল। তারপর নিজেও একটা নেয়। স্ট্র ফেলে দিয়ে ঢকঢক করে গলায় ঢালে কয়েক চুমুক। তারপর হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে স্বগতোক্তির মতো বলে– তুমি যে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে মেয়ে!

থমথমে হয়ে ওঠে উর্বীর মুখ– আমি তো তোমাকে জোর করে খেতে বলিনি।

জোর করে বলোনি? হবে হয়তো!

তোমার একথার মানে?

সব কথার মানে খুঁজতে যেও না উর্বী। সইতে পারবে না। নাও, কোক খেয়ে নাও।

অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হলো উর্বী। চিৎকার করল না বটে কিন্তু চাপা গলার হুংকার মনে হলো তার কথাগুলোকে– আমি মানে খুঁজিই না! কারণ তুমি মনে করো মানে খোঁজার যোগ্যতা আমার নেই। তুমি মনে করো, তোমার পাশে দাঁড়ানোর যোগ্যতা আমার নেই। ভালো কথা। নেই। আমার যোগ্যতা নেই। কিন্তু তুমি? তোমার দিকটাও একটু ভাবো। তুমি কী করতে পারো? আমাকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া, আমাকে অপমান করা ছাড়া? আর কী করতে পারো তুমি? ক্যাম্পাস জুড়ে মৌলবাদী সংগঠনের তাণ্ডব। ছেলেমেয়েদের অশ্লীলভাবে অপমান করে তারা। পারো ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে? শিক্ষকরা অপমানিত হয় ক্যাডারদের হাতে, পারো তার কিছু করতে? তোমার নিজের গ্রামে মৌলবাদীদের তাণ্ডব। তুমি তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারো? তুমি নিজেই তো নিজের গ্রামে পা রাখতে পারো না। তুমি যা পারো তা হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে আমাকে আঘাত দিতে। পারো আমাকে পদে পদে অপমান করতে। কারণ তুমি জানো যে আমি পাল্টা আঘাত করতে পারব না। কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আক্রমণটা এতই আকস্মিক এসেছে যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে কাইউম। একটা কথাও যোগায় না তার মুখে।

১৩.

বেলা প্রায় এগারোটা। পুরো মেসবাড়ি নিঃশব্দ। সবাই ক্লাশে চলে

গেছে। কাইউম যায়নি। নিজের পড়ার টেবিলে বসে বসে অর্থহীন নাড়াচাড়া করছে বই-পুস্তক। মনের ভেতরটা ফাঁকা। কাল উর্বীর কথাগুলো শুনে তীব্র অপমানবোধে আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু আজ সেটাও নেই। বরং সবকিছুকে অর্থহীন মনে হচ্ছে। তার সীমাবদ্ধতা এবং শক্তির ক্ষুদ্রতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে উর্বী। নিজেকে এখন সত্যিই নিতান্ত ক্ষুদ্র আর সবকিছুকে অর্থহীন মনে হচ্ছে।

হঠাৎ দরজায় টোকা।

দরজা খুলেই সে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে।

উর্বী!

তুমি এখানে!

ভেতরে আসব না?

এসো।

দরোজা পুরো মেলে দেয় কাইউম। টেবিলের পাশে একমাত্র চেয়ারটা দেখিয়ে দেয় উর্বীকে। উর্বী চেয়ারে বসে না। বসে টেবিলের সাথে খাট যেখানে মিলে গেছে, বিছানার সেই জায়গায়। ফলে শেষ পর্যন্ত কাইউমকেই বসতে হয় চেয়ারটাতে।

উর্বী চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে কাইউমের দিকে। কী যেন খোঁজে কাইউমের মুখে। কাইউম সচকিত হয়। একটু নড়ে-চড়ে বসে। জিজ্ঞেস করে– চা খাবে?

উর্বী সেকথার উত্তর দেয় না। পাল্টা প্রশ্ন করে– খুব রাগ করেছ?

রাগ? উঁহু। না, রাগ করিনি।

তাহলে ক্লাসে যাওনি কেন?

এমনি। ভালো লাগছে না। আর একদিন ক্লাসে না গেলে কী হয়?

বলার পরে একটু হাসে কাইউম– তাছাড়া নোট তৈরি করার জন্য তুমি তো আছোই।

উর্বী কথাকে বেঁধে রাখে আগের জায়গাতেই– রাগ করেছ আমার উপর?

বললাম তো। রাগ করিনি। প্রথমে অবশ্য একটু রাগ করেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম যে তোমার প্রতিটি কথা সত্যি। নির্মম হলেও সত্যি। তাই রাগ মুছে গেছে।

কয়েক মিনিট আবার নৈঃশব্দ। কেউ কথা বলছে না। হঠাৎ দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরতে দেখা গেল উর্বীকে। ফুঁপিয়ে উঠে মুখ ঢাকল দুইহাতে। কান্নার দমকে দমকে কাঁদছে শরীর।

চূড়ান্ত রকমের বিব্রত হয়ে পড়ল কাইউম। এই পরিস্থিতিতে কী করতে হয় জানা নেই তার। সে তাই খানিকটা হতভম্ব হয়ে চুপচাপ বসেই রইল। বারবার তাকাচ্ছে দরজার দিকে। মনের মধ্যে ভয়। কেউ এসে পড়ে কিনা।

খানিকক্ষণ কাঁদার পরে ধাতস্থ হলো উর্বী। চোখ মুছে ধরা গলায় বলল– আমাকে মাফ করে দাও!

শশব্যস্ত হয়ে উঠল কাইউম– আরে মাফ চাইতে হবে না। তুমি তো যা বলেছ সব সত্যি কথা।

উর্বী প্রবলবেগে মাথা নাড়ল– না না, তুমি আমাকে মাফ করে দাও!

মাফ করার কথা আসছে কেন? তুমি তো সত্যি কথা বলেছ।

না, আমি সত্যি কথা বলিনি। কাল যা বলেছি, তা আমার মনের কথা ছিল না।

মনের কথা না হলেও কথাগুলো সত্যি। সত্যিই তো আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র একটা প্রাণী। আমার কোনো ধরনের ক্ষমতা নেই।

না না। তুমি অনেক বড়।

কাইউম অল্প শব্দ করে হাসল– তোমার এই কথাটা আমি মানতে পারলাম না।

উর্বী এবার সোজা হয়ে উঠে বসে। বলে– তুমি আসলেই বড়। তা নইলে আমি অন্তত তোমাকে ভালোবাসতাম না।

বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

দেখো, তুমি যদি সরকারি ছাত্র সংগঠনে কিংবা মৌলবাদী দলটাতে যোগ দিতে, তাহলে শক্তি দেখাতে পারতে; সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তোমাকে ভয় পেত; শিক্ষকরা তোমাকে সমীহ করে চলত; তুমি ক্যাডার পুষতে পারতে; ক্যান্টিনে ফাও খেতে পারতে; চাঁদাবাজির ভাগ পেতে। আরো কত সুযোগ-সুবিধা পেতে। কিন্তু তা না করে তুমি নীতি ও আদর্শের জন্য বেছে নিয়েছ বিপদের পথ, ভয়ের পথ। তুমি যদি বড় না হও, তাহলে বড় কে? দেশটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা সবাই বুঝতে পারছে। কিন্তু কেউ কিছু করছে না। বরং তারা ধ্বংসের কাজে অংশ নিচ্ছে। তোমরা অল্প কয়েকজন মানুষ এই গড্ডালিকার বাইরে দাঁড়িয়েছ, মানুষকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছ। শুধু তোমাদের কয়েকজন দেখিয়েই বলা যায় যে এদেশের সবাই সুবিধাবাদী নয়।

এবার উর্বীকে থামিয়ে দিতে চাইল কাইউম– হয়েছে হয়েছে, আর বলতে হবে না।

আমাকে বলতে দাও কাইউম। নীতির জন্য তুমি কত বড় স্বার্থত্যাগ করছ তা আমি ভেবে দেখিনি আগে। তুমি নিজের গ্রামে যেতে পারছ না। অথচ আজ তুমি তোমার আদর্শ পরিত্যাগ করলেই সব বিপদ সরে যাবে তোমার মাথার উপর থেকে।

লজ্জায় কান লাল হয়ে উঠছে কাইউমের– তুমি থামো তো!

তারপরে ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলল– এখন বুঝতে পারছ, এমন মহান একজন ব্যক্তিকে তুমি গতকাল যা-তা বলেছ।

বলেছি। সেই জন্যেই তো আজ ক্ষমা চাইতে এসেছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন জীবনে আর কোনোদিন আমি তোমাকে ভুল না বুঝি।

একটু গম্ভীর হলো কাইউম– তুমি একটা ব্যাপার তো সত্যি বলেছিলে উর্বী। তোমার ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে আমি তোমাকে আঘাত করি। আমি অন্তর থেকে স্বীকার করছি কথাটা সত্যি। আমিও প্রতিজ্ঞা করতে চাই যে, পারতপক্ষে আমি আর তোমাকে আঘাত করব না। তোমার ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা করতে শিখব।

হেসে উঠল উর্বী– শ্রদ্ধা নয় সাহেব, আমি ভালোবাসা চাই।

তথাস্তু!

বলল কাইউম।

তারপর দুজনেই হেসে উঠল। প্রাণখোলা নির্ভার হাসি।

১৪.

সাব্বির ভাই এমএ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েই একটা গ্রামে চলে গিয়েছিল। নিজের গ্রামে নয়। অন্য একটা গ্রামে। সেখানে ওদের ক্ষেতমজুর সংগঠন আছে। তাদের সঙ্গে একনাগাড়ে চার মাস ছিল সাব্বির ভাই। ক্ষেতমজুর সংগঠনের কিছু কাজ করেছে হাতে-কলমে আর গ্রামস্টাডি করেছে গবেষকের দৃষ্টিতে। তার সেই স্টাডির আলোকে আলোচনা সভা।

স্টাডি সার্কেলের বিষয়বস্তু শুনে একটু ঠোঁট টিপে হেসেছিল কাইউম– আমরা গ্রামেরই ছেলে সাব্বির ভাই। গ্রামের পরিস্থিতি জানি। গ্রাম চিনতে আমাদের কোনো স্টাডির দরকার হয় না।

সাব্বির ভাইও হেসে বলে– গ্রামে জন্ম হলেও গ্রামের সবকিছু জানা থাকে না কাইউম। বিশেষ করে গ্রামীণ উৎপাদন সম্পর্ক এখন আর আগের মতো সরল নয়। এসো, আমি আমার রিপোর্টটা পড়ে শোনাই। যদি মনে হয় এতে নতুন কিছু নেই তাহলে বোঝা যাবে সমাজ সম্পর্কে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই খুব স্বচ্ছ। আর যদি নতুন কিছু খুঁজে পাও, তাহলে ভবিষ্যতে তোমরা যখন কৃষক আন্দোলন করবে কিংবা ক্ষেতমজুর আন্দোলন করবে, তখন কাজে লাগাতে পারবে। যাহোক, এসো শুরু করা যাক!

এক চুমুক পানি খেয়ে সাব্বির ভাই পড়তে শুরু করে রিপোর্ট–

এই স্টাডিতে গ্রামের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেমন সেই গ্রাম? আকাশ থেকে দেখা সবুজ পানির সুন্দর প্রবাহে সুন্দরতর পালতোলা নৌকায় ভরা ধানপাট আর গাছপালায় চোখ ভোলানো? না কর্কশ ফাটা মাটির রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে দেখা মুমূর্ষু আদিকালের মানুষের বসতি?

দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন আছে এখানে। কোত্থেকে দেখছি আমরা, কাকে দেখছি, কেন দেখছি, কিভাবে দেখছি? বাংলাদেশের গ্রামের সব মানুষকে কি একইভাবে দেখা যায়? সব মানুষের জীবনযাপন, হাসি-কান্না, দুঃখ-সুখ

কি একই রকম? একজন মানুষ কখন আরেকজন মানুষের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে? যখন দুজনের জীবনের ভিত্তি, অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থান একই রকম হয়। তেমন কি আছে বাংলাদেশে? আমাদের পর্যবেক্ষণ বলে– নেই। সেই জন্যই গ্রাম অর্থাৎ গ্রামের মানুষকে দেখতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থানকে ভিত্তি হিসাবে ধরতে হবে। তা নাহলে বিভ্রান্তি অনিবার্য।

গ্রামের মানুষকে তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যায়। এক অংশে রয়েছে গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যাদের হাতে কোনো জমি নেই, উৎপাদনের উপকরণ নেই। এরা পুরোপুরি নিজের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন গ্রাম জরিপ, বিভিন্ন মহলের গবেষণা এবং সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদের সংখ্যা শতকরা ৬৫তে দাঁড়িয়েছে। এই দলের মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য অংশের কোনো ঘরবাড়ি নেই, অন্যের বাড়িতে থাকে। এরা বিভিন্ন মৌসুমে অন্য গ্রামে বা শহরে গিয়ে কাজ করে।

দ্বিতীয় অংশে রয়েছে যারা তাদের স্বল্প উৎপাদন উপকরণ বা জমি আছে। এরা নিজেদের শ্রমের ওপরই মোটামুটি নির্ভরশীল, কখনো কখনো এরা অন্যদের শ্রমও নিজেদের জমিতে খাটিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে অন্যদের জমি বর্গা নিয়ে থাকে।

তৃতীয় অংশে আছেন গ্রামের মাথা ব্যক্তিরা। যাদের হাতে প্রচুর জমি রয়েছে, উৎপাদন উপকরণও রয়েছে যথেষ্ট। এরা অন্যদের শ্রম নিয়োগ করে নিজেদের জমিতে। তারা নিজেরাও কাজ করে। তবে তা করে পরিচালক, পরিদর্শক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে। এই দলভুক্ত ব্যক্তিরা নিয়ন্ত্রণ করে গ্রামীণ জীবন। ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বও এদের হাতে।

উপরোক্ত তিনটি প্রধান অংশ বা গ্রুপ ছাড়াও গ্রামে আছে মধ্য কৃষক, যারা মোটামুটি সচ্ছল। আর কিছু গ্রুপ ইদানীং বেশ উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে চলে এসেছে। এরা হচ্ছে ব্যবসায়ী, শিক্ষক, স্থানীয় শিক্ষিত অংশ। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আছে সার, রেশন, পল্লীবিদ্যুৎ সামগ্রী ইত্যাদির ডিলার, ধান-চাল-পাট-রবিশস্য ইত্যাদির ফড়িয়া, পাইকার, গ্রামেই অবস্থানরত ঠিকাদার। পেশাজীবী কিছু গ্রুপও কোনো কোনো গ্রামে রয়েছে। তাঁতী-জেলে-কামার-কুমোরদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি আছে। এরা মোটামুটি নিজস্ব পেশার লোকদের নিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ থাকে।

এ ধরনের সাধারণ বর্ণনা বাংলাদেশের প্রায় সব গ্রামের বেলাতেই মোটামুটি সত্য। কিন্তু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য রয়েছে অধিকতর অনগ্রসর কিছু এলাকায়। যেমন পার্বত্য এলাকা, চর এলাকা। এসব অঞ্চলে জোতদারি প্রথার প্রাধান্য খুব বেশি। এইসব জোতদারি বর্তমানে প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামোর সাথে জড়িত। বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন প্রভাবে এই জোতদারি প্রথা কিছুটা মার্জিত হয়েছে, তবুও এই প্রথা ব্যক্তির শাসন-শোষণকেই টিকিয়ে রেখেছে। এসব জায়গায় সরকারি আইনের চেয়ে স্থানীয়ভাবে প্রবর্তিত আইন অনেক বেশি শক্তিশালী।

গ্রামের জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের বহুবিধ দ্বন্দ্ব রয়েছে। রয়েছে বিরোধ। এই বিরোধ কোন পর্যায়ের কিংবা এই বিরোধ কোন চরিত্রের এটা খুঁজে পেতে হলে শ্রেণীগুলোকে সামনে রাখা প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা। স্বার্থের প্রশ্নও ভিন্ন। সেই কারণে গ্রামীণ উন্নয়ন বললেই গ্রমের মানুষের উন্নয়ন হয় না। গ্রামীণ মানুষের স্বার্থ একসাথে দেখতে গেলে সবার স্বার্থ দেখা হয় না, দেখা হয় শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ। মূলত সেই শ্রেণীর, যে শ্রেণী নিয়ন্ত্রণ করছে গ্রামীণ জীবনকে, একটা অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতায় জড়িয়ে রেখেছে গ্রামীণ মানুষদের। এই শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ-শক্তির উৎস কখনো জমি বা সম্পত্তি, কখনো বা উর্ধ্বতন প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক। সেই জন্য মুখে যতই বলা হোক না কেন যে সকল স্তরের মানুষের জন্য গণতন্ত্র; তা সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না এই কাঠামোর জন্য বা শ্রেণী বিভক্তির জন্য।

একটু বিরক্ত লাগছে কাইউমের। সাব্বির ভাইয়ের কথাগুলোর মধ্যে এমন কোনো নতুন তথ্য নেই। নেহায়েত অ্যাকাডেমিক রুটিন ওয়ার্ক করে রাখা। এমন গবেষণা হাজারে হাজারে পাওয়া যাবে বিভিন্ন জার্নাল ঘাঁটলে। আজকের গ্রামে যেসব নতুন ও জ্বলন্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট ধারণা না থাকলে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের কাছে পৌঁছানোর রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নিজের এই ভাবনাটিকে গুছিয়ে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে জানাল কাইউম।

যেমন? জানতে চাইল সাব্বির ভাই।

অন্য একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল– যেমন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থি দলগুলোর কার্যক্রম। এরা বিপ্লবের নামে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করেছে গ্রামে। আগে শোনা যেত বড় জোতদার, মহাজন শোষকরাই ওদের টার্গেট। এখন ওরা নির্বিচারে ছোট কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের কাছ থেকেও জোর-জবরদস্তি করে চাঁদা তোলে। তাদের ওপর অত্যাচার করে। ফলে গ্রামের মানুষ এখন সমাজতন্ত্রের নাম বললে ভয় পায়।

সাব্বির ভাই মুচকি হাসে– এটা তো অনেক আগে মীমাংসিত একটা প্রসঙ্গ। চরমপন্থি গ্রুপগুলো যে বিপ্লবের প্রকৃত শক্তি নয় তা ইতোমধ্যেই বুঝে গেছে গ্রামের সাধারণ মানুষ।

তো বুঝতে পারার পরে কী করেছে? যারা বিপ্লবের প্রকৃত শক্তি, তাদের পতাকাতলে এসেছে নাকি ভিড়ে গেছে বুর্জোয়া দলগুলোর ছায়াতলে।

বাস্তবতা হচ্ছে যে তারা আপাতদৃষ্টিতে চলে গেছে বুর্জোয়া দলগুলোর কবজায়। তবে তারা অচিরেই বুঝে ফেলবে যে ঐ দলগুলো তাদের প্রকৃত মিত্র নয়।

আচ্ছা একথা না হয় মেনে নেওয়া গেল। গ্রামগুলিতে ধর্মীয় মৌলবাদীদের অবস্থান কেমন?

খুব সামান্য। খুবই সামান্য। এদেশের মানুষ ধর্মভীরু হলেও ধর্মীয় মৌলবাদকে গ্রহণ করবে না কখনোই। ফলে ঐ মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর দশাও হবে নিষিদ্ধঘোষিত চরমপন্থি দলগুলোর মতোই।

তীব্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল কাইউম– গ্রামে গ্রামে বঙ্গভাইজাতীয় লোকদের তৎপরতা সম্পর্কে আপনার স্টাডিতে কোনো তথ্যই নেই কেন?

হাসার চেষ্টা করে সাব্বির ভাই– আরে, এসব তো খুবই সাময়িক উৎপাত। অনেকটা হুজুগের মতো।

হুজুগ! তাই মনে হচ্ছে আপনার? আমার গ্রামজুড়ে সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছে বঙ্গভাই। যাকে খুশি খুন করছে, যাকে খুশি পঙ্গু বানিয়ে দিচ্ছে। আফগানিস্তানের আদলে হুকুম করেছে যে প্রত্যেক পুরুষকে দাড়ি রাখতে হবে, প্রত্যেক মহিলাকে বোরখা পরতে হবে। তারা চাঁদা নেয় না, গ্রাম থেকে খাজনা নেয়। জিজিয়া কর আদায় করে।

হাঁফিয়ে উঠল কাইউম– স্যরি সাব্বির ভাই, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বর্তমানের গ্রামস্টাডির নামে আপনি তিন-চার মাস পণ্ডশ্রম করেছেন। গ্রামগুলো এখন ধর্মীয় মৌলবাদীদের অভয়ারণ্য। আপনার তা চোখে পড়েনি।

১৫.

দরজায় টোকা পড়ল।

রাত্রিবেলায় দরজায় টোকা-ধাক্কা মানেই বিপদের আশঙ্কা। রাত্রে তো গ্রামের কোনো লোক পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে যায় না। নিজ নিজ ঘরে খিল এঁটে রাখে। মনে চাপা আতঙ্ক। না জানি আজ কার পালা! রাতের রাস্তায় যদি পদধ্বনি ওঠে, তবে বুঝে নিতে হবে তা বঙ্গভাইবাহিনীর।

দরজায় শব্দ হতেই মুখ শুকিয়ে গেছে ফিরোজার। সে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল স্বামীর দিকে।

শব্দ কানে গেছে মনা মাস্টারেরও। ভেতরে ভেতরে তার একটা মানসিক প্রস্তুতি আছে। সে জানে আজ হোক, কাল হোক, তার ওপর একটা আঘাত আসবেই। তাকে শুধু শুধু ছেড়ে দেবে না বঙ্গভাই। দরজায় টোকা কি তারই সংকেত?

দরজায় আবার টোকা পড়ে। অসহিষ্ণু উদ্বিগ্ন টোকা।

ফিরোজা চাপা গলায় বলে– খবরদার খুলবে না দরজা।

তিক্ত একটুকরো হাসি ফোটে মনা মাস্টারের ঠোঁটে। ফিরোজা কী মনে করে? যদি বঙ্গভাইয়ের বাহিনীই এসে থাকে তাহলে ঐ পলকা দরজা কী

আর পারবে তাকে রক্ষা করতে! নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করে মনা মাস্টার। একটু কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে– কে?

দরজার ওপার থেকে ত্রস্ত গলায় প্রত্যুত্তর আসে– আমি হাজি মজিদ। মাস্টার দরজা খুলো!

হাঁফ ছেড়ে উঠে দরজা খুলে দেয় মনা মাস্টার। ভেতরে ঢোকে হাজি আবদুল মজিদ, জব্বার আলী আর বদরে আলম।

কী ব্যাপার? এত রাইতে? আপনেরা কষ্ট কইর‍্যা আসলেন! আমারে ডাকতেন। আমিই যাইতাম।

অত কিছু ভাবি নাই মাস্টার।

আসেন। বসেন।

টুল-চেয়ার এগিয়ে দেয় ফিরোজা। মেয়ে তার ঘরে বসে পড়ছে। একবার এসে দেখে কারা এসেছে। তারপর সালাম দিয়ে ফিরে যায় নিজের ঘরে। সামনে তার পরীক্ষা।

সবাই বসার পরে জিজ্ঞেস করে মনা মাস্টার– কী ব্যাপার হাজি সায়েব?

ব্যাপার তো তুমি সবই জানো! গাঁয়ের পরিস্থিতি তোমার অজানা কিছু নাই। একখান উপায় বাতলাও।

জব্বার আলী কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়ে– ইসলাম না হাতি! ঐ লোকটা, বঙ্গভাই একটা নমরুদ ফেরাউন। ঐ বাহিনী আসার পর থাইক্যা গ্রামডা তছনছ হয়্যা গেছে। ধর্মের নামে যারে খুশি মারতিছে-ধরতিছে, জবাই করতিছে। গোটা গেরাম যে জিম্মি হয়্যা পড়িছে মাস্টার।

এতদিন জানে মারিছে। এখন ধনেও মারা শুরু করিছে।

জব্বার আলীর ধানের মিল। তার প্রতি বঙ্গভাইয়ের হুকুম হয়েছে প্রতিদিন একবস্তা সরু চাল পৌঁছে দিতে হবে তার আস্তানায়। হাজি আবদুল মজিদকে দিতে হবে আটা-চিনি। ঘোষপাড়ার একরাম আলীকে দিতে হবে সপ্তাহে সপ্তাহে এক হাজার টাকা করে। মাছ-মাংস কেনার খরচ। এছাড়া প্রতিদিন হাট থেকে তোলা হিসাবে পেঁয়াজ-মরিচ, শাক-সবজি তুলে নিয়ে যাবে বঙ্গভাইয়ের লোকজন।

ওদের কথা শুনে মনে মনে হাসল মনা মাস্টার। এতদিন বঙ্গভাইবাহিনীর কাজকর্মে ওদের ছিল নীরব সম্মতি। এমনকি ওরা অমুক অমুক সর্বহারা, অমুক অমুক লালপতাকা বলে কানভারীও করেছে বঙ্গভাইয়ের। আজ এখন নিজেদের ধন-সম্পত্তির ওপর যখন হাত পড়েছে তখন ওরা ছুটে এসেছে কিছু একটা করার জন্য।

তাকে চুপ থাকতে দেখে ককিয়ে ওঠে জব্বার আলী– চুপচাপ ক্যান মাস্টার? একটা কোনো বুদ্ধি বাতলাও। এই জালেমের হাতে কি সক্কলে মিল্যা মরব?

আমি আর কী বলতে পারি! আপনেরাই কন কী করা যায়!

আমরা গাঁয়ের গণ্যমান্য মানুষ মিল্যা পুলিশের কাছে যাই চলো!

হেসে ফেলল মনা মাস্টার– আপনের কী মনে হয় পুলিশের সঙ্গে বঙ্গভাইয়ের যোগসাজশ নাই? পুলিশ তো ঐ বাহিনীর প্রটেকশন দ্যায়। ওসি দিনের মধ্যে দুইবার খোঁজ নিয়া যায় বঙ্গভাইয়ের। এই যে এতগুলান খুন করল ঐ বাহিনী, তাকি পুলিশ জানে না? অবশ্যই জানে। কিন্তু উপরের কোনো ইশারায় পুলিশ চুপচাপ আছে। শুধু তাই না সাথ দিচ্ছে বঙ্গভাইবাহিনীর।

তাহলে এক কাম করি চলো। আমরা কয়েকজন মিল্যা ঢাকা যাই। এলাকার মন্ত্রীর সাথে দেখা করি। হাজার হলেও তাঁই এই গেরামেরই সন্তান। আমরাই তো ভোট দিয়্যা তাক মন্ত্রী-এমপি বানাইছি। বুঝায়া কইলে তাঁই এই বিপদে পাশে দাঁড়াবি। তাঁই যদি পুলিশেক হুকুম করে, পুলিশ তাহলে অ্যাকশন নিতে বাধ্য।

কোনো লাভ হবি না। আপনে কি মনে করেন মন্ত্রী জানে না? মন্ত্রী ঠিকই জানে। তার দলের ক্যাডারবাহিনী বঙ্গভাইয়ের সাথে একসাথে অস্ত্র নিয়্যা ঘুরে না? আসলে মন্ত্রী সব জানে। কে জানে সেই হয়তো বঙ্গভাইরে পাঠাইছে সর্বহারা নির্মূলের নামে সব বিরোধী মানুষরে এলাকাছাড়া করতে। তার আলামত দেখতে পাচ্ছেন না!

তাহলে আমরা কী করি? এই বিপদ থেকে বাঁচার কি কোনো রাস্তা নাই?

আসলে উপায় নিয়ে প্রথম থেকেই ভাবছে মনা মাস্টার। যেদিন থেকে বঙ্গভাইয়ের বাহিনী অ্যাকশন শুরু করেছে, সেদিন থেকেই ভাবছে। অনেক ভেবেচিন্তে যা তার মাথায় এসেছে তা হলো গ্রামের একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে ঢাকায় যেতে হবে। প্রথম কাজ হবে প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন। সব ঘটনা দিন-তারিখসহ খুলে বলতে হবে মিডিয়ার সামনে। সঙ্গে নিহতদের আত্মীয়-স্বজনদের নিতে পারলে আরো ভালো হয়। সাংবাদিক-সম্মেলনের পর যেতে হবে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাছে, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে। সম্ভব হলে যেতে হবে বিদেশী দূতাবাসগুলোতে। তাদের সবাইকে সবিস্তারে জানাতে হবে কী ভয়াবহ সব ঘটনা ঘটে চলেছে এই এলাকায়। তারা যদি একযোগে সোচ্চার হয়ে ওঠে, একমাত্র তখনই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসন, পুলিশ বাধ্য হবে বঙ্গভাইয়ের বিরুদ্ধে লোকদেখানো হলেও পদক্ষেপ নিতে। একমাত্র এভাবেই বঙ্গভাইয়ের নির্যাতন থেকে গ্রামবাসীকে মুক্ত করা সম্ভব।

তার কথায় সায় দিল হাজি আবদুল মজিদ আর জব্বার আলী। হ্যাঁ। সারবত্তা আছে বটে মাস্টারের কথায়। তাদেরও বিশ্বাস একমাত্র এভাবেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব এই পরিস্থিতি থেকে।

তাইলে তাই করো মাস্টার। চলো ঢাকা যাই!

তাই যেতে হবে। নিজেকে বোঝায় মনা মাস্টার। এ কাজেও বিপদের ঝুঁকি আছে। তবু কাজটা তাকে করতেই হবে। আরো আগে কাজটা করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু সে যদি একাই ঢাকাতে যায়, তাহলে তার কথায় মানুষ তেমন গুরুত্ব না-ও দিতে পারে। একথা ভেবেই এতদিন চুপচাপ বসে ছিল সে। এখন যখন গ্রামের গণমান্য লোক, ময়-মুরুব্বি যখন তার সাথে যেতে চাইছে, তখন এই প্রতিনিধি দলটির গুরুত্ব নিয়ে আর কোনো সংশয় থাকে না।

এই পরিকল্পনাকেই চূড়ান্ত করা হলো। আগামীকাল গোপনে গোপনে আরো কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। পরশুদিন ভোরেই তারা রওনা দেবে ঢাকার উদ্দেশে।

১৬.

এমন দুঃখী, এমন উপদ্রুত গ্রামেও তিথিতে তিথিতে জ্যোৎস্না বর্ষিত হয়। এশার নামাজ পড়ে বেরিয়ে বদরে আলম দেখে পল্লী বিদ্যুতের আলোকে ম্লান বানিয়ে জ্যোৎস্না দখল করে নিয়েছে সমস্ত গ্রামের আকাশ। গ্রামের উত্তর পারের গোরস্তানমাঠ তাকে তখন ডাকে। বদরে আলমও সাড়া দেয়। এক পা এক পা করে চলে আসে গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে। পথে মুখোমুখি হয়েছিল বঙ্গভাইবাহিনীর। টহলরত জঙ্গিরা তাকে চিনে নিয়েছে এতদিনে। কেউ কিছু বলেনি। সে নির্বিঘ্নে চলে আসতে পারে জ্যোৎস্নাধোওয়া মাঠে।

আল্লার কী কুদরত!

জ্যোৎস্না ঢুকে যাচ্ছে তার লোমকূপে লোমকূপে। সমস্ত দেহ-মন আলোকিত হয়ে উঠছে বদরে আলমের। তার মনে হয় জ্যোৎস্না নয় যেন ঝরছে আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমা। বিশ্বচরাচর ডুবে যাচ্ছে সেই ক্ষমার অপার্থিব আলোকে। রাতজাগা পাখি থেকে থেকে ডাকছে বাতাস চিরে। সেই কর্কশ ডাককেও আজ মনে হচ্ছে পাখিদের আনন্দ প্রকাশের অভিব্যক্তি।

চোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে বদরে আলমের। এই সুন্দর ফুল, এই সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি, খোদা তোমার মেহেরবানী। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে পড়ে বদরে আলম। খোদা তুমি চোখ দিয়েছিলে, আজ এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখে চোখদুটোকে সার্থক করে নিতে পারি তাই। তুমি কান দিয়েছিলে। সেই কান দিয়ে শুনতে পাই গাছপালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ তোমারই নামগানে মশগুল।

অবশ্যপালনীয় পাঁচ অক্ত নামাজ আজকের মতো সমাধা করতে পেরেছে সে, তবু আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় বার বার মাথা নুয়ে আসছে তার। সেজদা করতে ইচ্ছা করছে আবারও। সে জ্যোৎস্নায় পশ্চিমমুখো হয়। হাঁটু গেড়ে বসে। তারপর চিত্তসমর্পিত সেজদায় আভূমি নত হয়। বদরে আলম সেজদায় যায়। সেজদা ছেড়ে তার আর উঠতে ইচ্ছা করে না। সে সেজদাতেই কাটিয়ে দিতে থাকে পলের পর পল।

হঠাৎ মাটি আর্তনাদ করে ওঠে– বাবারে মারে বাঁচাও, পায়ে ধরি, আমাক জানে মারিস না!

চমকে মাথা তোলে বদরে আলম।

শুধু মাটি নয়, আর্তনাদ করছে বাতাসও।

ও বাবারে... ও ও মরে গেছি মা! ও মা রে...

ও–ও–ও–ও...

আর্তনাদ ছাপিয়ে সপাং সপাং শব্দ ওঠে কয়েকটা। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদের আওয়াজ বেড়ে ওঠে কয়েক পর্দা– আল্লারে মরে গেছি... মা রে... ও মা...

হঠাৎ-ই বিভ্রম কেটে যায় বদরে আলমের। মাটি আর্তনাদ করছে না। বাতাসও আর্তনাদ করছে না। আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছে মসজিদ চত্বরের বঙ্গভাইয়ের টর্চার ক্যাম্প থেকে। নতুন পদ্ধতি বের করেছে বঙ্গভাই। টর্চার করার সময় হতভাগার মুখের সামনে রেখে দেয় মাইক। সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে তার আর্তনাদ। যতদূর এই শব্দ ছড়ায় ততদূর ভীতি আরো গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ে বঙ্গভাইয়ের নামে।

বদরে আলম কানে আঙুল দেয়।

কিন্তু তারপরেও তার মগজে আছড়ে পড়তে থাকে আর্তনাদের শব্দ।

এই জ্যোৎস্না, চরাচরব্যাপী জ্যোৎস্না, পবিত্র মোলায়েম অপার্থিব জ্যোৎস্না মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় বদরে আলমের চোখের সামনে থেকে।

আর্তনাদের শব্দ আরো বাড়ে।

বদরে আলমের শরীর কেঁপে ওঠে। ভীতিতে।

আশ্চর্য! একটু পরেই ভীতি উধাও হয়ে যায়। তার জায়গা নেয় ক্রোধ।

বদরে আলম এখন ক্রোধে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

১৭.

আপনে এই গেরাম ছাইড়া চল্যা যান জনাব!

চায়ের কাপ ঠোঁটে তুলেছিল বঙ্গভাই। বিস্ময়ে হাত থেকে চা-সহ ছিটকে পড়ে কাপ। বিষম খায় সে। খুব জোর বিষম। যত বেশি বিস্ময়, তত জোরে বিষম। কাশির দমক ওঠে তার। কাশতে কাশতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসে।

অনেকক্ষণ সময় লাগে ধাতস্থ হতে। জোব্বার হাতায় চোখের পানি মুছে পিটপিট করে তাকায় সে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বদরে আলমের দিকে। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না এই লোকটা বলেছে কথাগুলো। নিজের অজান্তেই প্রশ্ন বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে– কী বললে তুমি?

আপনে এই গেরাম ছাইড়া চল্যা যান জনাব!

স্থির-নিষ্কম্প গলায় একটু আগে বলা কথাটার হুবহু পুনরাবৃত্তি করে বদরে আলম।

ঘরের মধ্যে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে বঙ্গভাইয়ের অন্তত আটজন ক্যাডার। তারা পর্যন্ত হা হয়ে গেছে বদরে আলমের কথা শুনে। বলে কী লোকটা! এমন সাহস কোথায় পেল!

নিজেকে ততক্ষণে পুরোপুরি সামলে নিয়েছে বঙ্গভাই। ব্যাঙ্গ করে জিজ্ঞেস করল– আমাকে চলে যেতে হবে কেন?

কারণ এইডা আল্লার ঘর। এই ঘরে মানুষ আসবি আল্লার এবাদত করার জন্যে। আপনে সেই ঘর নাপাক করিছেন।

সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হতাশার ভঙ্গি করে বঙ্গভাই– লোকটা নিঃসন্দেহে পাগল হয়ে গেছে।

কিন্তু কোনো বিকার নেই বদরে আলমের। সে ধীরস্থিরভাবে বলে চলে– আমরা এই গেরামের মানুষ– সুখে থাকি, দুখে থাকি, কষ্টে থাকি, আমরা আমাদের মতো থাকি। আপনের জন্যে এই এলাকার মানুষ আর নিজেরা নিজেদের মতো কর‍্যা বাঁচতে পারে না। আপনে চল্যা যান!

রোগা-ঢ্যাঙা, নীলজোব্বা, লুঙ্গি, সাদা টুপিপরা বদরে আলমের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসে মাথা ঝাঁকালো বঙ্গভাই– কে পাঠিয়েছে তোমাকে?

কেউ পাঠায়নি, আমি নিজে নিজেই আইছি।

কেন এসেছ? তোমার কি মরার খুব শখ? যদি মরার খুব শখ থাকে তাহলে যাও কোনো গাছের ডালে দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ো, না হয় কুয়াতে ঝাঁপ দাও। যাও ভাগো!

না আমি যাব না। আপনে আগে গেরাম ছাড়েন।

উঠে দাঁড়ায় বঙ্গভাই। বদরে আলমের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার সাপচোখ রাখে বদরে আলমের চোখে। হিস হিস করে বলে– ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না বলে তোকে এবারের মতো মাফ করে দিলাম। যা, দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।

একথায় হঠাৎ করে ক্ষেপে যায় বদরে আলম। চিৎকার করে বলে– এই মজ্জিদ আমার। দিন-রাত খাটাখাটনি করি আমি এই মজ্জিদের জন্যে। টাকা তুলি। মানুষের কাছে হাত পাতি। এই মজ্জিদ আমার। তুমি একখান শয়তান, নমরুদ-ফেরাউন জোর কর‍্যা দখল নিছো এই মজ্জিদের। তুমি চল্যা যাও এক্ষুণি।

তেড়ে আসে এক ক্যাডার। দড়াম করে লাথি মারে বদরে আলমের পাঁজরে।

মাটিতে পড়েও সমানে চ্যাঁচাতে থাকে সে– এই মজ্জিদ আমার। তোমরা ছেড়ে দাও আমার মজ্জিদ।

দু'জন এগিয়ে আসে। বদরে আলমকে চ্যাঙদোলা করে ছুঁড়ে দেয় দরজা দিয়ে বাইরে।

সেখানে কিছুক্ষণ পড়ে থাকে বদরে আলম। তারপর হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসে। সর্বশক্তিতে চিৎকার করে– গ্রামবাসী ভায়েরা মায়েরা, এই শয়তান নমরুদ-ফেরাউন বঙ্গভাই আল্লার দুশমন। ইসলামের দুশমন। জোর কর‍্যা এই মজ্জিদ দখল কর‍্যা পাপের আখড়া বসাইছে। তোমরা আসো। এই শয়তানরে তাড়াতে হবি।

উঠে দাঁড়িয়ে উদ্বাহু চিৎকার করতে থাকে সে– ভায়েরা মায়েরা তোমরা আসো! এই শয়তানরে তাড়াতে হবি। এই নমরুদ-ফেরাউনরে খতম করা লাগবি!

কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না তার ডাকে। ■